রাত্রিবাস : আগরতলায় থাকার জন্য আছে ত্রিপুরা ট্যুরিজমের 'হোটেল গীতাঞ্জলি'। এসি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ২০০০-২৫০০ টাকা (কর অতিরিক্ত), বেসরকারি হোটেলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'হোটেল সোমরাজ রিজেন্সি', দ্বিশয্যা ঘর (এসি) ১৫০০-৩০০০ টাকা। ফোন : (০৩৮১) ২৩৮২০৬৯/২৩৮৫১৭২ (আগরতলার এসটিডি কোড-০৩৮১)।

ত্রিপুরার বাঙালির পছন্দের রসনা

বিস্তারিত তথ্য ও সরকারি টুরিস্ট লজ বুকিংয়ের জন্য কলকাতা যোগাযোগ : অতুল দেববর্মা, ত্রিপুরা ট্যুরিজম (কলকাতা শাখা), ত্রিপুরা ভবন, ১ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা-৭১, ফোন : ৯৩৩১২৩১৪৫৯ (মোবাইল), (০৩৩) ২২৮২-৫৭০৩ (কলকাতা কোড-০৩৩)।

আগরতলায় রসনাতৃপ্তি : বাঙালি তো মাছে-ভাতে থাকতেই ভালবাসে, আর সে মাছ যদি হয় বাংলাদেশের (যার সীমান্ত খুবই কাছে এখানে) সুস্বাদু ইলিশ, তবে তো কথাই নেই। তা ছাড়াও তেলকই, পাবদা মাছের ঝাল, স্থানীয় আউইন্যা মাছের ঝাল (চিকেন, মাটন তো আছেই) ইত্যাদি রকমারি আকর্ষণীয় পদের সমাহারে রসনাতৃপ্তি যে চরমপর্যায় পৌঁছবে, তা বলাই বাহুল্য।

আগরতলা শহরেই এই সব আকর্ষণ নিয়ে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি : 'পাঁচফোড়ন রেস্তোঁরা' (অফিস লাইন, এসডিএম অফিসের কাছে), ফোন : ৯৮৫৬০৯২০০১, ৯৮৫৬০৯৩০০৮।

কেনাকাটা : বাঁশ, বেত ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ত্রিপুরার বিখ্যাত হস্তশিল্পের বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করতে পারেন আগরতলা শহরের সরকারি 'পূর্বাশা' এম্পোরিয়াম থেকে, হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্টস ছাড়া হ্যাণ্ডলুম সামগ্রীও পাওয়া যায় এখানে। ❑

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥

[অ : ১২, শ্লোক : ৯]

অনুবাদ ঃ হে ধনঞ্জয়, যদি তুমি আমাতে স্থিরভাবে চিত্ত সমাহিত করিতে না পার, তাহা হইলে অভ্যাস-যোগের দ্বারা আমাকে লাভ করিতে যত্ন কর।

[অ : ১২, শ্লোক : ৯]

শ্রীশ্রী রামঠাকুর

অরুনাংশু হোর

শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন আড়ম্বরহীন সাধারণ মানুষের মত। বাহ্যিক আবরণের কোন বালাই ছিল না। প্রথম দর্শনলাভের সৌভাগ্যের দিন হতে যত দিন সুস্থ দেহে ছিলেন একখানি ধূতি ও একটি চাদর তাঁহার পরিধেয় ছিল। শীতে-গ্রীষ্মে সর্বদাই একই পোশাকে থাকতেন। জীবনের শেষ ভাগে আশ্রিতরা তাঁকে গরম জামা, কাপড় প্রভৃতিতে ভূষিত করতেন। ঐগুলি তিনি ইচ্ছামত দান করে দিতেন। পুঁথিগত বিদ্যা তাঁর অবিদিত ছিল বলা চলে। তবু তিনি সর্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। মহান আত্মার ভাবাবেশে তিনি কথা বলতেন। তাঁর সামনে উপস্থিত হলে সবারই মস্তক আপনিই অবনত হয়ে যেত। খুব মিষ্টি ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। ভাবোচ্ছ্বাসগুলি ছিল স্বর্গের দৃশ্যের মত। পাপী, অজ্ঞ, মূর্খ, সমাজের পরিত্যক্ত যত আবর্জনা সবাইকে তিনি কোলে টেনে নিতেন। যাই তিনি স্পর্শ করেছেন, সেটাই পবিত্র হয়ে যেত। এমন কোন মলিনতা ছিল না যা সেই পুণ্যের আলোকে একটা কলঙ্কের দাগ দিতে পারে। সুগভীর জ্ঞান ও পবিত্রতা তাঁর কাছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত স্বাভাবিক ছিল। আপন-পর তাঁর কাছে অবিদিত ছিল। সবাই তাঁর কাছে ছিল সমান; সর্বাধিক প্রিয় বলতে তাঁর কেউই ছিল না, তাঁর কাছে যিনিই যেতেন, তাকেই ঠাকুর অতি প্রিয়জন ভাবতেন।

> সে যখন বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠলো, মা-বাবা তখন তার বিয়ের জন্যে উপযুক্ত বরের খোঁজ করতে শুরু করলেন। মেয়েটা তখন তাঁদের অত্যন্ত জোরের সাথে বললো, "তোমরা আমার বিয়ের কোন চেষ্টা কোরো না। আমার স্বামী এখনও বেঁচে আছে, হিন্দু ঘরের মেয়েদের দু'বার বিয়ে হয় না"। মেয়ের এই কথা শুনে তার মা-বাবা স্বভাবতই বিচলিত হয়ে পড়লেন।

ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাইকে তিনি 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। এমন কি বাড়ির ঝি, ভৃত্য বা পরিচারিকা, রাস্তার কুলি-মজুর, যাদের সাধারণত আমরা তাচ্ছিল্যভরে 'তুমি' বা 'তুই' বলে সম্বোধন করি, তাদেরও ঠাকুর 'আপনি' বলতেন আর সসম্মানে নিজের কাছে এনে বসাতেন। সকল জাতি-ধর্মের মধ্যে তিনি সত্যকে দেখতেন। যা কিছু মঙ্গল, যা কিছু সুন্দর সবই তাঁর মধ্যে ছিল বর্তমান। প্রীতি, ভক্তি, ত্যাগ ও সেবায় তাঁর সমগ্র জীবন নিবেদিত ছিল। যেখানে তিনি যেতেন, সেখানে সকল দুঃখ ও অনুযোগ স্তব্ধ হয়ে যেত। তিনি সাধারণত স্নান করতেন না, অথচ তাঁর দেহ সবসময়েই পরিষ্কার থাকতো আর একটা সুন্দর গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো। তবে একবার মজঃফরপুরে থাকাকালীন তিন দিন ঠাকুরের সমস্ত শরীরে দই মাখিয়ে স্নান করান হয়েছিল। পুরীতে সমস্ত দিন সমুদ্র সৈকতে বালির মধ্যে বসে থাকার কারণে তাঁর গায়ে বালি ও কাদা লেগে যেত। ঐ সময় ২২ দিন প্রতিদিনই ঠাকুরকে স্নান করান হত। কেউ জোর করে তাঁর পরিধেয় কাপড়-জামা পাল্টে না দিলে তিনি ওভাবেই থাকতেন। যেখানে যখন অবস্থান করতেন তাঁর ভক্তরা সাধারণত তাঁর পরিধেয় কাপড়-জামা পরিষ্কার করে দিতেন। কোন দিন তাঁকে ভাত খেতে দেখা যায়নি। বরাবরই সামান্য ফল-মূল, দই, সন্দেশ এবং কখনো কখনো সামান্য লুচি-তরকারি খেতেন। মানকচু, ওলকচু, কাঁচাকলা, বিচিকলা, ঢেঁড়স, মর্তমান কলা ও চালতার আচারও কখন কখন বিশেষ পছন্দ করতেন।

তন্ত্র, মন্ত্র, বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য, দর্শন, জ্যোতিষ গণনা, ডাক্তারী, কবিরাজী প্রভৃতি সব শাস্ত্রেই তাঁর সমান অধিকার ছিল। ভারতের প্রচলিত ভাষাগুলি সবই তিনি জানতেন। শ্রীমুখের গীতার ব্যাখ্যা বাজারে প্রকাশিত কোন ভাষ্যে পাওয়া যায় না। যারা সৌভাগ্যক্রমে শ্রীমুখে গীতার ব্যাখ্যা শুনেছেন, তাঁরাই মুগ্ধ হয়ে বলতেন, এমন ব্যাখ্যা আগে কখনো শোনেননি। তাঁর কাছে জাতিভেদ ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, সবাই মানবজাতি। সকলকে তিনি কোল দিয়েছিলেন। হিন্দুর মন্দির, মুসলমানের মসজিদ, খ্রীষ্টানদের গির্জ্জা, সবগুলিকে তিনি এক মনে করতেন। ঠাকুর স্বয়ং মক্কা-মদিনা মুসলমান-তীর্থক্ষেত্র দর্শন করেছিলেন। তিনি বলতেন, ধর্মানুযায়ী প্রত্যেকেরই এক গুরু। পীর বা ধর্মযাজকের নিকট হতে দীক্ষা বা নাম গ্রহণ করে ঐ নাম বা মন্ত্র জপ করে ভগবানের আরাধনা করতে হয়। সর্বধর্মই এক ভগবানকে নির্দেশ করে। ভগবান এক এক সময় এক এক অবতারের স্থান, কাল ও লোকের স্বভাবানুযায়ী এক এক ধর্ম প্রচার করেন। সুতরাং ভগবানের আরাধনায় আবার ভেদাভেদ কেন? যে-কোন ধর্ম উৎসবে সব জাতিই যোগদান করতে পারেন। যারা নাম পেয়ে বা দীক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন, ঠাকুর তাঁদের সবাইকে বলেছিলেন, "এই নাম জীবনের একমাত্র সম্বল।" পূজা-অর্চনা, ভোগ নিবেদন যা কিছু করবেন, ঐ নাম স্মরণ করে করবেন। সর্বদা নাম জপ করলে অন্তিমে কৈবল্য-প্রাপ্তি হবে।

শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের উদ্বোধনের আগেই শ্রীমৎ হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঠাকুর ধামের প্রথম মোহান্ত হিসেবে মনোনীত করে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন ঠাকুরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। তিনি সেতার বাজিয়ে ভক্তিমূলক গান গাইতে ভালোবাসতেন এবং আধ্যাত্মিকতার রহস্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা উপভোগ করতেন। ১৯৩৫-এর ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর জীবনাবসান হলে ঠাকুরের নির্দেশে মোহান্ত হন শ্রীমৎ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমৎ চট্টোপাধ্যায় পঁচিশ বছর ধরে মোহান্ত ছিলেন এবং তাঁর কার্যকালের

মধ্যে তিনি শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম ও ধামের অন্যান্য সব মন্দিরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ প্রচুর করেছিলেন। নতুন নতুন ভক্তদের নামদানের পূর্ণ অধিকার ঠাকুর তাঁকে এবং পরিবর্তি সব মোহান্তদের দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দীক্ষা নেয়ার জন্যে সবাই ব্যাকুল হয়ে থাকতো। তাঁর কাছ থেকে নাম পাওয়া ছিল এক পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। ঠাকুরেরই একজন পরম ভক্ত সতীন্দ্র বাবুর বয়স তখন ত্রিশের কোঠায়। থাকতেন নোয়াখালীর পুরান শহরের নাগ পাড়াতে। শ্রীশ্রীঠাকুরের থেকে নাম পাওয়ার ইচ্ছে সেনবাবু দীর্ঘদিন ধরেই মনে পোষণ করতেন। কিন্তু ঠাকুরের দেখা পাওয়াই ভার। তাই সেনবাবু ভাবলেন দ্বিতীয় মোহান্ত মহারাজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকেই নাম নেবেন। দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব। সেনবাবু অস্থির আর চঞ্চল। এমন সময় খবর পেলেন প্রেমের ঠাকুর এসেছেন পুরনো টাউনে, শ্রীশুভময় দত্তের বাসায়। সেনবাবু ছুটে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পেলেন। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর বললেন, "রাম যেই, শ্যামও সেই।" সেন বাবুর নাম নেওয়া হলো না। আরো পরের কথা, ঠাকুর এলেন কুমিল্লায়। জেল ডাক্তারের বাসায়। অবস্থান করবেন মাত্র একদিন। সতীন্দ্রবাবুর কানে খবরটি পৌঁছলো। কালবিলম্ব না করে ছুটে গেলেন কুমিল্লায়। গিয়ে দেখলেন ঠাকুর নেই। ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে আগেই বেরিয়ে পড়েছেন। সেনবাবুও হলেন ষ্টেশনমুখী। ভাগ্য সুপ্রসন্ন। যান্ত্রিক গোলযোগ। ট্রেন ছাড়তে দেরি হবে। সেনবাবুরতো খুশীর সীমা নেই। ঠাকুরের কামরার দিকে এগিয়ে গেলেন। চোখ বড় করে সেনবাবু তাকালেন শ্রীমুখের দিকে। দয়ার ঠাকুর দিব্যদৃষ্টি মেলে বললেন, "বড় কষ্ট কইরা আইছেন, নাম নেন।" সেনবাবু নাম পেলেন।

অনেক দিন পরের কথা। সেনবাবু তখন সংসারী। পেশা-কবিরাজি। রাজগঞ্জ বৈদ্যবাড়ির ছেলেরা পুরুষাণুক্রমেই কবিরাজ। ব্যবসাস্থল মাইজদী। বাড়ী থেকেই যাতায়াত করেন। রাত প্রায় ৯টা, কৃষ্ণপক্ষ। জয় রাম বলে সেনবাবু কর্মস্থল থেকে যাত্রা করলেন বাড়ির দিকে। পথ চলেছেন একা। রাজগঞ্জ বাজার পেরুলেন। সামনে বিশাল এক বটবৃক্ষ। গাছের ছায়ায় ঐ স্থানটি ঘিরে অন্ধকার গাঢ়তর হলো। সেনবাবুর মনে ভীতির সঞ্চার হলো। মনে মনে উচ্চারণ করলেন, "জয় রাম"। পরক্ষণে দেখলেন অপরিচিত এক বৃদ্ধ। হাতে হ্যারিকেন। টিমটিমে আলো। চিমনি ধোঁয়ায় অন্ধকার।

বৃদ্ধ : যাবেন কোথায়?
সেনবাবু : বৈদ্য বাড়ি।
বৃদ্ধ : আমি পাশের বাড়িতেই যাব, চলুন।

বৃদ্ধ চললেন আগে আগে। সেনবাবু পিছে পিছে। সেনবাবুকে পৌঁছে দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, এবার আসি। সাড়া পেয়ে গিন্নী পংকজিনী দেবী দরজা খুললেন। কবিরাজ বাবু পেছনে ফিরে দেখেন বৃদ্ধ নেই। পরদিন পাশের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানলেন এমন কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি ও-বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেননি।

বিক্রমপুরের কোন একটি অখ্যাত গ্রামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর স্ত্রী ও একটি মেয়েকে নিয়ে বাস করতেন। মেয়েটি ছোটবেলা থেকেই তার বাবা-মাকে বলত, "আমার স্বামী আছে, তোমরা আমার সিঁথিতে আর কপালে সিঁদুর, হাতে শাখা পরিয়ে দাও"। মা, বাবা এসব শিশুর চপলতা-প্রসূত মনে করে হাসতেন, কোনই গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু বয়েস বাড়ার সাথে সাথে মেয়েটার ওসব কথাবার্তা ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগলো। সে যখন বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠলো, মা-বাবা তখন তার বিয়ের জন্যে উপযুক্ত বরের খোঁজ করতে শুরু করলেন। মেয়েটা তখন তাঁদের অত্যন্ত জোরের সাথে বললো, "তোমরা আমার বিয়ের কোন চেষ্টা কোরো না। আমার স্বামী এখনও বেঁচে আছে, হিন্দু ঘরের মেয়েদের দু'বার বিয়ে হয় না"। মেয়ের এই কথা শুনে তার মা-বাবা স্বভাবতই বিচলিত হয়ে পড়লেন। উপায়ান্তর না দেখে একজন বড় তর্কপঞ্চানন পণ্ডিতের কাছে তাঁরা পরামর্শের জন্যে গেলেন। পণ্ডিতপ্রবরের পরামর্শে ব্রাহ্মণ স্বপরিবারে তখন তীর্থ ভ্রমণে বের হয়ে গেলেন। বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ শেষে তাঁরা বৃন্দাবনে এসে পৌঁছুলেন। সেখানে একদিন ব্রাহ্মণ স্ত্রী-কন্যাসহ যমুনার ঘাটে যান। এই সময় ঠাকুরও একটু দূরে অন্য ঘাটে হাত মুখ ধুচ্ছিলেন। মেয়েটা তখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখামাত্র বলে উঠলো, "বাবা, ঐ যে আমার স্বামী, আপনারা আমাকে তাঁর কাছে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলুন"। ব্রাহ্মণ দম্পতি তখন কালবিলম্ব না করে যমুনার সেই ঘাটে শুভ্র উপবীতধারী ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে মেয়েকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে বললেন, "আপনি দয়া করে আপনার পত্নীকে গ্রহণ করুন"। ঠাকুর তখন কোন কথা না বলে মেয়েটার হাত ধরে সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। ব্রাহ্মণ দম্পতি কিছুক্ষণ নিশ্চলভাবে এই দৃশ্য অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন। এদিকে সেই মেয়েকে নিয়ে ঠাকুর বহুদূরে একটি জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের উপর গেলেন। ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে একেবারেই দুঃসাধ্য ছিল। পাহাড়ের সানুদেশে একটা বিশাল শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, ঐখানে বসে তিনি সেই মেয়েকে দীক্ষা প্রদান করলেন আর তাকে সেই শিবলিঙ্গের সামনে রেখে চলে গেলেন। ঠাকুর কয়েকজন ভক্তকে বলেছিলেন, "ব্রাহ্মণ কন্যাটি অদ্যাপি সেখানে আছেন, তাঁর সর্বাঙ্গ হইতে জ্যোতি বাহির হইতেছে"। ঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে ভক্তরা জেনেছেন যে, প্রতিদিন স্বর্গের অস্পরাগণ সেই মেয়েকে স্নান করাতে আসেন আর দেব -দেবীরা তাঁকে পূজা করেন। ঐ স্থানের নাম যোগযোগেশ্বরী আশ্রম, সাধারণ মানুষ সেখানে যেতে পারে না, দূর থেকে শঙ্খ ঘন্টার ধ্বনি শোনা যায়, ধূপ-ধুনোর গন্ধও পাওয়া যায়। কোথায় সেই আশ্রম জানতে চাইলে ঠাকুর বলতেন, "সে অনেক দূর"।

একবার এক ভক্ত ঠাকুরকে বললেন, 'ঠাকুর চিরদিন ত রান্না নিয়েই থাকলাম। কুম্ভ মেলায়ও গেলাম না, মনে বড় দুঃখ রয়ে গেলো'। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন, 'মা মনে দুঃখ রাখতে নাই। কুম্ভ গৃহী-সংসারী লোকের জন্য নয়। কুম্ভমেলা সাধু মহাত্মাদের জন্য। তবে লোক সকল কুম্ভে যায়, সাধু দর্শন হয় এই যা, সকলেরই কুম্ভস্নান হয় না।' তারপর ঠাকুর তাঁকে বললেন 'মা, আপনার মনে কুম্ভস্নানের দুঃখ আছে। আপনি এক ঘটি জল আনেন।' মা এক ঘটি জল ও গামলা আনলেন। ঘটির মধ্যে এক সেরের মত জল ছিল। আর গামলায় কোন জল ছিল না, তাতে অবশ্য ৫/৮ সেরের মত জল ধরে। ঠাকুর খাটের উপর বসে গামলায় শ্রীপাদপদ্ম রাখলেন। মা তার বীজমন্ত্র জপ করতে করতে ঠাকুরের শ্রীচরণে ঘটির জল ঢালতে লাগলেন। সেই ঘটির জল ঠাকুরের শ্রীচরণ ধুয়ে কুলু কুলু শব্দ করে গামলা ভর্তি হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। আশ্চর্যের বিষয় গামলা থেকে ঘটি অনেক ছোট ছিল, এত জল কোথা থেকে এলো? সেই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখে উপস্থিত সব ভক্তদের মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়।

ঠাকুর তখন ফেনী কলেজের প্রফেসর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসায় আছেন। ঠাকুরের সঙ্গে থাকা তাঁর এক ভক্ত গত তিন চারদিন ধরে বাড়ি যাননি। তিনি ভাবলেন, মা কি করে বাজার খরচের ব্যবস্থা করছেন একবার গিয়ে দেখা দরকার। এই ভেবে তিনি বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। বাড়ি পৌঁছা মাত্র তাঁর মা বললেন, "এই, বাজার খরচা কিছু দিয়ে যাস, গত দু'দিন ধরে বাজার করি না।" ভক্তটি তখন হাঁ বা না উত্তর না দিয়ে বাড়ি থেকে সরে পড়লেন। কারণ তখন তার হাতে কোন পয়সা ছিল না। প্রমথবাবুর বাড়িতে ফিরে তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করা মাত্রই তিনি তার দিকে তাকিয়ে বালিশের তলায় হাত দিলেন আর সেখান থেকে কয়েকটা টাকা বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন, "যান, মাকে এই টাকা কয়টা দিয়ে আসেন"। ঠাকুর যে অন্তর্যামী এবং তাঁর অজানা যে কিছুই ছিল না, সেটা ওই ভক্ত তখন মনে মনে অনুভব করেছিলেন। পরে তিনি সেই টাকা বাড়িতে গিয়ে তার মার হাতে তুলে দেন। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুবার সাথে সাথেই তিনি শুনলেন, "বাবু, চাউল রাখবেন?" বাইরে তখন অবিরাম ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। তিনি ভাবলেন, "ভুল শুনিতেছি না তো", কিন্তু আবার সেই ডাক- "বাবু, চাউল রাখবেন?" কৌতূহল পরবশ হয়ে তিনি উত্তর দিলেন, "কে? বাড়ির ভেতরে এস।"– চালের ভাঁড় নিয়ে বাড়ির ভেতরে আসলো এক বৃদ্ধ, বয়েস অনুমান ৬০/৬৫ বৎসর। তিনি সেই বুড়োকে বললেন, "আমার আতপ চালের প্রয়োজন।" বৃদ্ধ তখন বলল, "আতপ চাউলই এনেছি, দেখুন।" বৃদ্ধকে তিনি বললেন, "চাল আমার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু এখন মাসের শেষ আমার হাতে টাকা নেই। ইংরাজী মাসের দুই-তিন তারিখের আগে দিতে পারব না, আমাকে বাকিতে দিতে হবে।" বৃদ্ধ তখন বললো, "আমি আপনাকে চিনি, এখন টাকা না দিলেও চলবে– মাসকাবারে দেবেন।" সেই মুহূর্তেই চালের সমস্যা এভাবে সমাধান হওয়ায় সেই ভক্ত একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যে সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে আছেন এবং আমাদের রক্ষা করে চলেছেন, সেটা বুঝতে আর কোন অসুবিধে হইনি ওই ভক্তের।

একদিন জনৈক ভক্ত, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, "কৃপাসিন্ধু রামঠাকুর" গ্রন্থের গ্রন্থকার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "জাতক অশৌচ বা মৃত অশৌচ" নারায়ণ শীলা ও গুরু "পাদপদ্ম" স্পর্শে কোন বিধি-নিষেধ আছে কি না? এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছিলেন, "ঘরে যদি বৃদ্ধ পিতামাতা থাকেন, তবে তাগো সেবা করেন না? খাইতে দেন না? ঠাকুর সেবাও সেই মন নিয়া করবেন।" শ্রীশ্রীঠাকুর কীভাবে আশ্রিতের ডাকে আবির্ভূত হয়ে ভক্তকে উদ্ধার করেন, নিশঙ্ক চিত্তে এগিয়ে যেতে পথ প্রদর্শন করেন এমন একটি ঘটনা ঠাকুরের একান্ত শিষ্য আগরতলার প্রথিতযশা প্রধান শিক্ষক শিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত জানিয়েছিলেন। তিনি নিজে পূজায় উপস্থিত ছিলেন। কুঞ্জবন হিন্দি কলেজ হোস্টেলে পূজা শেষে যোগেশ্বর কর্মকারের জীবনে ওই অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পূজার ব্যবস্থা ওই হোস্টেলে হয় এবং তার পূজক ছিলেন তারিনী ভট্টাচার্য। সত্যনারায়ণ পূজা, নাম, গান, ভোগ নিবেদন, আরাধনা এবং প্রসাদ বিতরণ এসব শেষ হতে রাত ১২টা বেজে যায়। তখনকার আগরতলা দিনেই শুনশান আর এত গভীর রাতে সবাইকে প্রসাদ বিতরণ শেষ করে ও নিজে প্রসাদ গ্রহণ করে যখন বাড়ির দিকে চললেন কর্মকার, সঙ্গিগণ অন্য রাস্তায় চলে যাওয়াতে তিনি প্রায় ছুটতে ছুটতে পথ অতিক্রম করছিলেন। মনে ভয় তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম জপ করে চলেছেন। কিন্তু সামনে তাকিয়ে তিনি মনে যেন ভরসা পেলেন। যোগেশ্বর বাবুর সামনে কিন্তু একটু দূরে এক বৃদ্ধ হেঁটে চলেছেন এবং মাঝে মাঝে পেছনে ফিরে তাকাচ্ছেন। বৃদ্ধের পায়ে লাল কেটস্, হাতে লাঠি এবং গায়ে কম্বল। যোগেশ্বর বাবু হাঁপাতে হাঁপাতে আর দৌড়ে ওই বৃদ্ধকে পার হয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন– আপনি দৌড়ান ক্যান?

যোগেশ্বর বাবু– আমি একা হয়ে পড়েছি। আমার সঙ্গের সকল লোক চলে গেছেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক– কোথায় গিয়েছিলেন?

যোগেশ্বর বাবু– শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পুজো ছিল, সেখানে গিয়েছিলাম।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক– কে সত্যনারায়ণ?

যোগেশ্বর বাবু– শ্রীশ্রী রামঠাকুরের প্রচার করা সত্যনারায়ণ।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক– দৌড়ান ক্যান! আমি তো ঠাকুরকে দেখেছি।

যোগেশ্বর বাবু– আমি একা।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক– ঠাকুর ত বলেছেন– 'আমি ত আপনাগো সঙ্গে সঙ্গেই থাকি।' আপনি একলা কীভাবে হইলেন? গুরু ত সঙ্গে থাকেন। এভাবে বৃদ্ধের সাথে সাথে যোগেশ্বর বাবু হেঁটে চৌমুহনীতে এলেন। কিন্তু পাশে তাকিয়ে তিনি দেখেন ওই বৃদ্ধ

অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তার চার দিকে তাকিয়ে কোথাও তিনি দেখতে পেলেন না এই বৃদ্ধকে। ভয়, বিপদ বা যে কোনো অবস্থায় ঠাকুর আশ্রিতদেরকে উদ্ধার করেন। এ তাঁরই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই স্মৃতি যোগেশ্বর বাবু যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিনই প্রচার করে গেছেন। ঠাকুর বলতেন, ভক্ত ডাকুক বা নাই ডাকুক, সদ্‌গুরু সব সময়ই তাঁর আশ্রিতদের রক্ষা করেন, তাদের সাথে সাথে থাকেন। তিনি বলতেন, নামই সত্য, সত্য বৈ আর কিছুই নাই। নামই সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিবে। নাম বৈ আর কিছুই শান্তি দিতে পারে না। ভাগ্যে যাহা আছে তাহা ভোগ করিতেই হয়। ভোগই ক্ষয়, ভাগ্যে যাহা নাই তাহা কোথা হইতে আসিবে? কাহারও ইচ্ছায় কোন কিছুই হয় না। চেষ্টা ত করিতেছেন, চেষ্টা করিতে করিতে যেটুকু ভাগ্যে আছে, সেটুকুই আসিবে। সকল ভার গুরুই বহন করিতেছেন, করিবেন। তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না। যাহা পারেন করিবেন, না পারেন না করিবেন। কিন্তু সর্বদা গুরুপদে অনন্যমতি হয়ে থাকিবেন। গুরুকৃপা হইতে সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়া যায় আর ভগবানকে লাভ করা যায়। তিনি সমস্ত স্থানেই আছেন। আপনি আপনাকে হতভাগ্য বোধ করেন কেন? গুরুর আশ্রয় পেলে আর কি আপন বলতে কিছু থাকে? যত আড়ম্বর কমান যায় ততই শান্তির উদ্‌যাপনা হইয়া থাকে। ভগবান নির্জন, নিভৃত অনাবৃতেই উদয় থাকেন, আবরণ মায়া। শীশ্রীঠাকুর আরও বলেছেন, সত্যনারায়ণকে ভুলিবেন না। তাঁহার কৃপায় এই মরভূম হইতে জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। ভাগ্যানুসারে জীব দেহ, গেহ, সমাজ পাইয়া থাকে। কর্মেই জীবের অধিকার, ফলে নহে। ফলদাতা সত্য জানিবেন। ❑

ঋণঃ

১) রাম ঠাকুরের কথা– ডঃ ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি আর এস
২) শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেব– শ্রী শুভময় দত্ত
৩) সাধু দর্শন ও সৎসঙ্গ– ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ, পদ্মবিভূষণ
৪) শ্রীশ্রী রামঠাকুর– শীশ্রীকৈবল্যধাম, যাদবপুর, কলকাতা।
৫) শ্রীশ্রী কৈবল্যধাম আশ্রম, চট্টগ্রাম।
৬) লীলা মাধুরী।

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রাহ্মণঃ পথি ॥
[অ : ৬, শ্লোক : ৩৮]

অনুবাদ ঃ হে কৃষ্ণ! ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে কর্মযোগ ও ধ্যানযোগ হতে বিভ্রান্ত, বিমূঢ় ও নিরাশ্রয় যোগী ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় কি বিনষ্ট হন? *[অ : ৬, শ্লোক : ৩৮]*

Humanity, Human Rights & Hindu Religion.

Nani Gopal Debnath

Whenever we get the privilege, generally we try to visit our Temples as much as possible. These visits give us Ethical and spiritual spirit in mind and body. However we are not bound to only pray in Temples, as we can pray at home or for that matter anywhere else because God is omnipresent. Here I want to explain why really my family & I visit Temples for different puja occasions while options available to do puja or prayer at home. In our Temples after puja, priests or religious scholars deliver some speech, at the end of the speech they mention always these words "সব মানুষের বা মানবজাতির মঙ্গল হউক, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা, (I mean they say that we pray for wellbeing of all human being.) আমরা মন্দিরে কখনো কাউকে বলতে শুনিনি যে সকল হিন্দুর মঙ্গল হউক, (Anybody never says wellbeing only for the Hindus.)" this signify that in our Temple we pray for Humanity, which to me is the root of Hinduism. So I experience Human Dignity when I visit Temples. Hinduism doesn't recognise human beings as mere material beings. Its understanding of human identity is more ethical-spiritual than material. It is on the principle that the soul that makes the body of all living organisms its residence is in fact an integral part of the Divine Whole (পরমাত্মা) that the *Vedas* declare obviously. Democracy and human rights are ongoing conversations in today's world. It is worth mentioning here that world had come up with the ideals of French Revolution or for that matter the first Article of the Universal Declaration of Human Rights (1948) that urge to do something like:

One of my wife's friends from Dhaka University had invited us to dinner at her residence in Toronto, where many other such friends were present, it was an enjoyable gathering, but suddenly one lady brought religion in the discussion.

"All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are gifted with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood". (*France declaration of Human Rights,1948*)

Three famous ideals of the French Revolution i.e. Liberty, Equality and Fraternity have subsequently found place in almost all the democratic constitutions of the world including that of India (I am referring to present day India, Bangladesh on the other hand is struggling for such a constitution).

Liberty and Equality are the ideals that can be achieved through constitutional means. But for achieving Fraternity we need something more than constitutional means. For Fraternity a sense of common brotherhood of all human being of the country is very important.

'No one is superior or inferior; all are brothers; all should strive for the interest of all and progress collectively'. In fact the *Vedas* emphasized these a thousand years back for the entire humanity which today's world aggressively trying to implement after 1948 declaration.

Here I think it would be appropriate to mention an embarrassing situation of mine in my personal life that I am sure will resonate with others who may have experienced the same.

One of my wife's friends from Dhaka University had invited us to dinner at her residence in Toronto, where many other such friends were present, it was an enjoyable gathering, but suddenly one lady brought religion in the discussion, used some abusive words against Hindu religion knowing that my wife & I were the only Hindu couple present. In these situations I usually reserve my opinions, as if to neglect such unintelligent remarks.

Surprisingly one gentleman started talking, questioning that lady's knowledge about Hindu religion or did whether or not she read *Veda /Upanishad* etc! And explained that he had gone through all religious philosophies including Veda /Upanishad, Bible, Quran etc. further concluded that before making such improper hateful words she should make the effort to read and try to gather knowledge. The Lady had no answer & kept silent, virtually whole environment among us had pin drop silence.

In this quiet situation my feeling was like a huge blow of cold breeze blowing over my head and as if I was sitting near a calm deep Sea with few ripples on the surface of water.

Our sitting arrangement was such that I was not able to see clearly the face of the gentleman (who responded to

the lady) mentioned about Veda/Upanishad, he could not see my face either. I was very curious in this climactic situation in my mind to see the face of the gentleman, and to my surprise he was a known person to me, we used to work together for Student's Union (ছাত্র ইউনিয়ন) during Bangladesh Liberation movement period, he was one year senior to me at BUET, Dhaka. We generally called him as জ্ঞান ভাই (Knowledgeable elder brother) because from student life he was a very knowledgeable person, and was a frequent and quiet fast of a reader. If a volume of book we generally took 1 week to finish, he would have finished it in 2 days. Among our friends if any argument came in some questions, we used to say let জ্ঞান ভাই solve the critical cases, because of his valued & careful touch.

So I spoke out Hey জ্ঞান ভাই "you are here?" He also uttered the same Hi Nani "you are here as well?" We met may be after 35 years of gap and it was a very pleasant dinner finally.

From above example it is clear that a true knowledgeable person can never speak out against Hinduism, whose root lies on Humanity? And people like জ্ঞান ভাই can understand what Fraternity really means.

"The *RigVeda* is the first of the four *Vedas* and is considered the essence of all knowledge – জ্ঞান। In fact the *Vedas* emphasise the classic oneness of the entire creation."

"What does Fraternity mean?" Dr. B.R. Ambedkar, the Architect of Bharat's Constitution questioned, and went on to explain that "Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians – of Indians being one people. It is this principle that gives unity and solidarity to social life." (*B.R. Ambedkar and Human Rights, Complete Works*)

Fundamental Unity :

Human dignity cannot be ensured merely through constitutional means. It has to be rooted in the basic value system of the society. The ancient sages of Bharat have thus visualized the grand idea of the oneness of আত্মা and পরমাত্মা universal oneness of human beings based on মনুষ্য চেতনা the collective consciousness. That the same Consciousness spread through all creation is the greatest contribution of the Hindu classical thought to the wisdom of the world.

"In all the world there is no kind of framework within which we find consciousness in the plural. This is something we construct because of the temporal plurality of the individuals. But it is a false construction… The only solution to this conflict, in so far as any is available to us, lies in the ancient wisdom of the *Upanishads*". (Swami Jitatmananda, *Modern Physics and Vedanta*, Sri Ramakrishna Ashrama, Rajkot).

Upanishads are the fountainhead of Hindu philosophy which the great German philosopher Schopenhauer described as "the solace of my life" (*Harbilas Sharda, Hindu Superiority*). Vedic and *Upanishadic* literature abounds in ideas that proclaim universal oneness and universal well-being. Hinduism is the essence of all that wisdom handed down to generations after generations. These ideas have shaped and guided the Hindu socio-religious life for centuries.

The World as One Family – is unique in this age of Globalisation in the sense that while the ancient sages of Bharat have proclaimed that the whole humanity is like a big extended family, the modern-age pundits want us to believe that the whole world is, in fact, a huge market. While the Hindus stand for One World, the Globalisation stands for One Market. In reality what we are actually achieving is not Globalisation, but McDonalization.

While emphasizing on the fundamental unity of আত্মা consciousness, Hinduism does recognize that there exists diversity in God's creation. This diversity is not seen by a Hindu as inappropriate. Neither does set out to destroy this diversity in the quest for uniformity when talking about the oneness. Diversity in form and unity in spirit is what Hinduism stands for.

The secular ideals of Europe are emerging in front of the Hindu ideal of 'Equal Respect for all Religions'. Whereas the secular ideology stops at calling for 'tolerance' to the diversity, Hinduism goes much further. It doesn't just tolerate; it accepts every religion. It goes beyond all barriers of religious intolerance and even celebrates diversity but Humanity might be paramount.

Right of Happiness:

Hinduism is the religion of happiness. It considers the Right of Happiness to be the highest fundamental right of all humans. The ultimate goal for Hinduism is material and spiritual well-being of the mankind. It is relevant to mention here that this all important Right of Happiness doesn't find a place in the acclaimed Universal Charter of Human Rights.

In the sense the modern thinkers are not the first to think in terms of the welfare and happiness of the mankind. However the 'Maximum Benefit to Maximum Number' principle of the modern economic thought was never accepted by the ancient Hindu Philosophy. 'Total Good of All Beings' has been the root-ideal of Hinduism.

Highest Obligation:

Another significant aspect of the Hindu view on Human Rights is its emphasis on duties. In fact Hinduism doesn't support the idea of separation of Rights and Duties. Thus in Hindu discourse no Right is absolute. All the Rights bestowed upon a section enjoin upon another section corresponding Duties too. And for a Hindu the highest obligation is কর্ম performance of his Duty.

"These Fundamental Rights represent the basic values cherished by the people of a country since the *Vedic* times and they are calculated to protect the dignity of the individual and create conditions in which every human being can develop his personality to the fullest extent".

Conclusion:

No way of life or philosophy can be free of contemporary deviations. Hinduism is no exception. The only reservation is about exclusivist medieval codes which refuse to allow other faiths to survive. The supreme salvation of Hinduism, which is no different than realization of Self as an essential component of the Divine Whole, is achieved thus by peaceful coexistence rather than aggressive ambition, by cooperation rather than competition. ❑

Ref: THE INTERNATIONAL CONFERENCE, HUMAN DIGNITY AND HUMAN RIGHTS, HINDU PERSPECTIVE, Geneva, 2008.

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥
[অ : ১৩, শ্লোক : ৩৫]

অনুবাদ ঃ যাঁহারা উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর প্রভেদ জানেন এবং ভূতসমূহের অবিদ্যারূপ প্রকৃতির মিথ্যাত্ব জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা জ্ঞাত হন, তাঁহারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

[অ : ১৩, শ্লোক : ৩৫]

বিগ ব্যাং-এর পরের সেকেণ্ডে পৌঁছে কী দেখলেন বিজ্ঞানীরা?

সুজয় চক্রবর্তী

বিগ ব্যাং-এর ঠিক পরের সেকেণ্ডে পৌঁছে গেলেন বিজ্ঞানীরা এই সে দিন। আর রীতিমতো গায়ে কাঁটা দেওয়া সেই 'মাহেন্দ্রক্ষণে' পৌঁছে গিয়ে পদার্থের সম্পূর্ণ নতুন একটা অবস্থার হদিশ পেয়ে গেলেন তাঁরা। যে অবস্থাটার কথা তাঁদের কস্মিন কালেও জানা ছিল না। দেখলেন, কণাদের কাটা হাত-পা, আত্মাও!

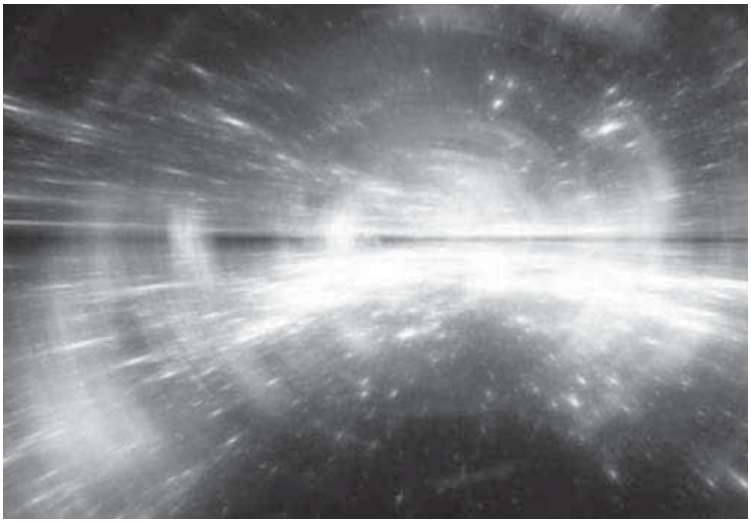

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ঠিক আগের মুহূর্তে যে মহা-বিস্ফোরণ হয়েছিল, তাকেই আমরা বিগ ব্যাং বলে জানি। সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ঠিক এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ পরেই যে ঘটনা ঘটেছিল, এই সে দিন তাজ্জব বনে গিয়ে সেটাই চাক্ষুষ করলেন বিজ্ঞানীরা।

বিগ ব্যাং-এর ঠিক পরের সেই সময়ে পৌঁছে গিয়ে বিজ্ঞানীরা যা দেখেছেন, তাতে তাঁদের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছে, একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে তাঁরা বিস্ফারিত চোখে বলাবলি করতে শুরু করেছেন, ''হচ্ছেটা কী? এটা আবার হয় নাকি?''

এমনটা তো সত্যি-সত্যিই এত দিন জানা ছিল না বিজ্ঞানীদের জেনিভার অদূরে ভূগর্ভে সার্নের লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের (এলএইচসি) 'অ্যালিস' ল্যাবরেটরিতে পদার্থ বা ম্যাটারের একেবারে নতুন একটি অবস্থার খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি তো আলাদা হয়েই যায় ওই অবস্থায়, এমনকী, কণাদের 'দেহ' থেকে 'আত্মা'কেও আলাদা করা সম্ভব আমরা যাকে 'একাত্মা' বলে জানি, সেটাও আদতে 'একাত্মা' নয়। তার মধ্যেও রয়েছে দু'টি সত্তা। দু'ধরনের অস্তিত্ব।

সেটা কী রকম?

কোয়ার্ক কী জিনিস? দেখুন অ্যানিমেশন

কলকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব সায়েন্সেসের (আইএসিএস) অ্যাকাডেমিক ডিন, বিশিষ্ট কণা-পদার্থবিদ সৌমিত্র সেনগুপ্তের কথায়, "কোনও মৌলিক পদার্থের (হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন বা অক্সিজেন) পরমাণুর হৃদয়ে (নিউক্লিয়াস) যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাগুলি থাকে তার একটি প্রোটন (ধনাত্মক আধান বা চার্জের কণা), অন্যটি একেবারে 'শ্রীনিরপেক্ষ' নিউট্রন (যার ধনাত্মক বা ঋণাত্মক কোনও আধানই নেই)। সেই প্রোটন আর নিউট্রনের মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাগুলিও গড়ে ওঠে কোয়ার্ক ও অ্যান্টি-কোয়ার্কের মতো আরও ছোট ছোট কণিকা দিয়ে। ছ'ধরনের কোয়ার্ক রয়েছে। আপ, ডাউন, টপ, বটম, চার্ম ও স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক। এই কোয়ার্কগুলির মধ্যে ওজনে বেশ কিছুটা ভারী স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক। স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক প্রোটন ও নিউট্রনের শরীর গড়ার ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকা নেয় না। কারণ, বেশি ভর বা ওজন মানেই বেশি শক্তি (আইনস্টাইনের $e = mc^2$ সমীকরণ)।

> সৌমিত্র বাবুর কথায়– "এটা দু'ভাবে হতে পারে। প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষের ফলে যে কিউজিপি তৈরি হল ধসেখানে থাকা গ্লুওন কণিকাদের মধ্যে সংঘর্ষ থেকে জন্ম হতে পারে ওই স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্কের। না হলে, কোয়ার্ক ও অ্যান্টি-কোয়ার্কের মধ্যে সংঘর্ষ থেকে জন্মাতে পারে স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক।"

সেই বিগ ব্যাং

ওই 'বহুরূপী' কোয়ার্কগুলোকে একে অপরের সঙ্গে বেঁধে রাখে গ্লুওন নামে আরও একটি খুব ছোট্ট কণা। স্ট্রং ফোর্স বা অত্যন্ত শক্তিশালী বলের বাঁধনে। এই ব্রহ্মাণ্ডে বল বা ফোর্স রয়েছে মোট চার রকমের। মহাকর্ষীয় বল, তড়িৎ-চুম্বকীয় বল, দুর্বল (উইক) বল আর শক্তিশালী (স্ট্রং) বল। নামেই মালুম, চারটি বলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী স্ট্রং ফোর্সই। যা আবার সবচেয়ে কম এলাকার মধ্যে কার্যকরী থাকে। এতদিন বিজ্ঞানীরা জানতেন, দু'টি আপ আর একটি ডাউন কোয়ার্ক দিয়ে গড়ে ওঠে

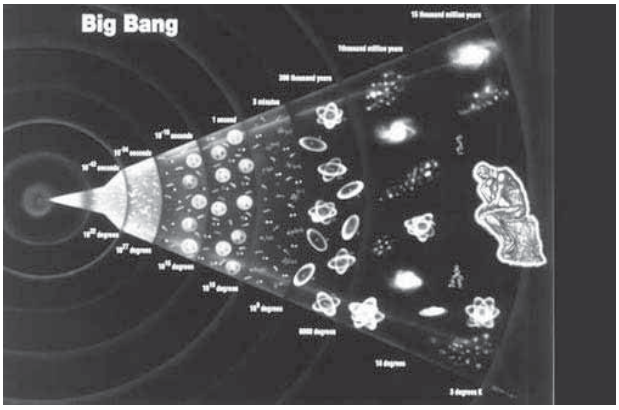

বিগ ব্যাং-এর পরের এক সেকেণ্ডের বিভিন্ন ভগ্নাংশ সময়ে যা যা ঘটেছিল

প্রোটন কণার শরীর। তার শরীরে আর কিছুই থাকে না। এও জানতেন, সেই প্রোটনগুলি বা তাদের শরীরে থাকা আপ আর ডাউন কোয়ার্কগুলিকে খুব জোরালো বলে যে বেঁধে রাখে, তার নাম গ্লুওন।

সেই বলের জোর এতটাই যে, কোয়ার্ক আর গ্লুওন কণাগুলিকে আলাদা করা যায় না। কোয়ার্ক বা প্রোটনগুলিকে একে অপরের সঙ্গে বেঁধে রাখতে গ্লুওন কণাগুলি কাজ করে অনেকটা স্প্রিংয়ের মতো। স্প্রিংকে যেমন টানলে তা আরও সঙ্কুচিত হয়ে আগের অবস্থায় ফেরার জন্য আরও বেশি করে 'উৎসাহী' হয়ে ওঠে, ঠিক তেমন ভাবেই একটি প্রোটন কণাকে আরেকটি প্রোটন কণা থেকে

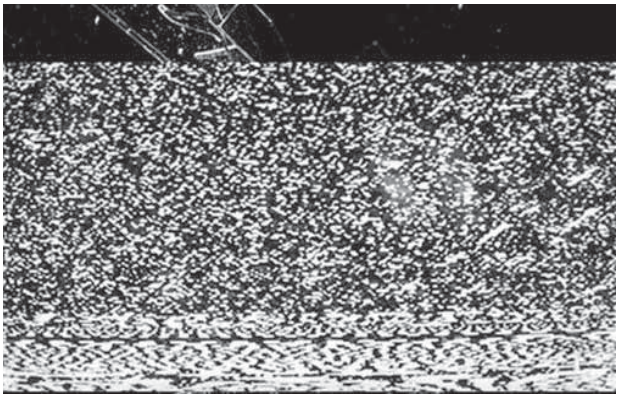
টেলিভিশনে হঠাৎ সম্প্রচার বন্ধ হলে যা দেখি। এটা সেই বিগ ব্যাং-এর বিকিরণেরই 'ভস্মাবশেষ'

দূরে সরাতে গেলে তা আরও বেশি করে একে অপরের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। অনেকটা 'ছাড়ালে না ছাড়ে অতি পুরাতন ভৃত্য' গোছের অবস্থা। বা, কোনও জমজমাট দাম্পত্যের কথাই ধরুন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আকছার বচসা হচ্ছে। মুখ দেখাদেখি বন্ধ হচ্ছে। কিন্তু বাইরে থেকে এসে যদি কেউ সেই দাম্পত্যে চিড় ধরানোর চেষ্টা করে, তা হলে আদর্শ দাম্পত্যের ক্ষেত্রে স্বামী, স্ত্রীর মধ্যে বন্ধনটা আরও জোরালো হয়ে যায়।''

তাপমাত্রা বা শক্তি (যাকে বলা হয় 'এনার্জি ডেনসিটি') কম থাকলে একটি কোয়ার্ক থেকে অন্য কোয়ার্ককে বা কোয়ার্ক থেকে গ্লুওন কণিকাকে কিছুতেই আলাদা করা যায় না। তারা জড়িয়ে থাকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে। যেন 'একাত্মা' কিন্তু তাপমাত্রা বা শক্তির পরিমাণ যদি এক লাফে অনেকটাই বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হলে সেই বন্ধনে ফাটল ধরে। কোয়ার্ক-গ্লুওনের খুব জোরালো 'দাম্পত্য' ভেঙে যায়। তৈরি হয় একটি স্যুপের। কোয়ার্ক, অ্যান্টি-কোয়ার্ক আর গ্লুওনের সেই স্যুপকে বলা হয় 'কোয়ার্ক-গ্লুওন প্লাজমা' (কিউজিপি)। যা অসম্ভব রকমের তাপমাত্রায় কোনও পদার্থের অত্যন্ত গরম ও ঘন অবস্থা।

সেই তাপমাত্রাটা কত, জানেন?

সল্টলেকের **ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টারের অধিকর্তা বিশিষ্ট কণা-পদার্থবিজ্ঞানী বিকাশ সিংহ** বলছেন, "ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির আগে যে মহা-বিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং হয়েছিল, তার

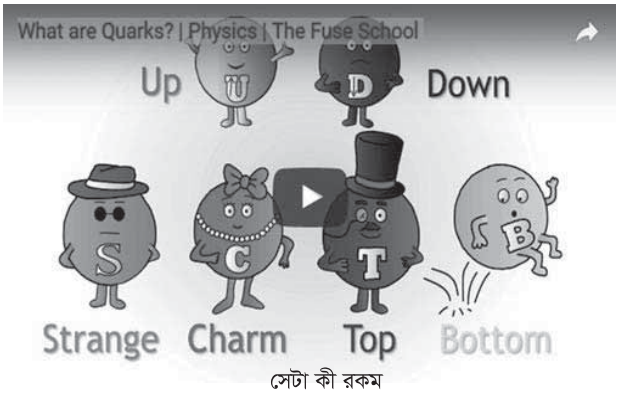

সেটা কী রকম

এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেই সেই তাপমাত্রাটা কিন্তু নেমে গিয়েছিল ঝুপ করে। কারণ, তখন প্রচণ্ড গতিতে, অসম্ভব দ্রুত হারে ফুলে-ফেঁপে উঠতে শুরু করেছিল এই ব্রহ্মাণ্ড। এটাকেই বলে 'ইনফ্লেশন'। সেই সময়েই কোয়ার্ক, অ্যান্টি-কোয়ার্ক, গ্লুওনের মতো কণিকাগুলির জন্ম হতে শুরু করে। যে সব মৌলিক পদার্থের 'হৃদয়'টা বড়, নিউক্লিয়াসটা বেশ ভারী (মানে, যাদের নিউক্লিয়াসে প্রোটন আর নিউট্রন কণাদের সংখ্যাটা বেশি), তাদের মধ্যে খুব বেশি তাপমাত্রায় সংঘর্ষ (কলিশন) ঘটালে কোনও পদার্থের যে এই ধরনের অদ্ভুত অবস্থার (কোয়ার্ক-গ্লুওন প্লাজমা) জন্ম হয়, এটা আগে অবশ্য জানতে পেরেছিলেন বিজ্ঞানীরা। '৯০-এর দশকে সার্নের ভূগর্ভস্থ লার্জ

সেই বিগ ব্যাং

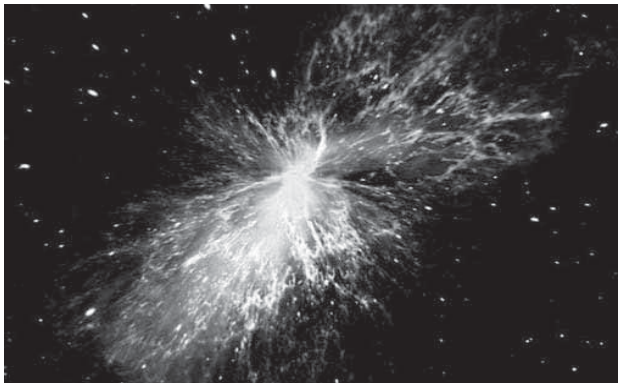

হ্যাড্রন কোলাইডারেই তার হদিশ মিলেছিল। কিন্তু যেটা মজার ঘটনা, তা হল, বিগ ব্যাং-এর পর পরই (বা, পরের সেকেণ্ডে) তো আর ভারী নিউক্লিয়াসের মৌলিক পদার্থের জন্ম হয়নি। তার জন্ম হয়েছিল বিগ ব্যাং-এর বহু কোটি বছর পর। বিগ ব্যাং-এর পরের

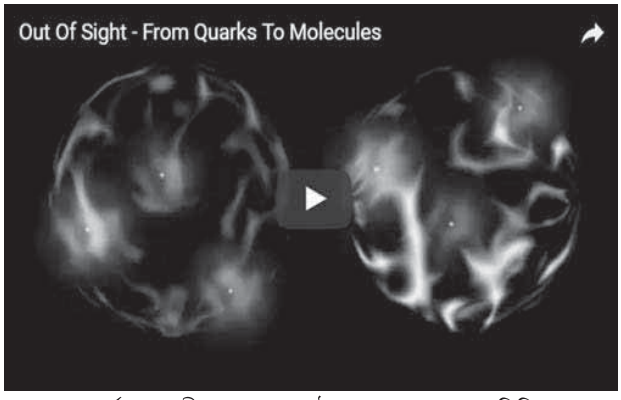

কোয়ার্ক থেকে কী ভাবে গড়ে ওঠে অণু, পরমাণু, দেখুন ভিডিও।

সেকেণ্ডে ছিল শুধুই প্রোটন, নিউট্রনের মতো পদার্থের নিউক্লিয়াসের 'রত্ন'দের শরীর বানানোর 'কারিগর'রা। কোয়ার্ক, অ্যান্টি-কোয়ার্ক, গ্লুওনের মতো 'ইউনিট' কণিকাগুলি। বাড়ি বানাতে যেমন ইট লাগে, সেগুলি ছিল তেমনই প্রোটন, নিউট্রন বানানোর ইট, বালি, পাথর, চুন, সুরকি।"

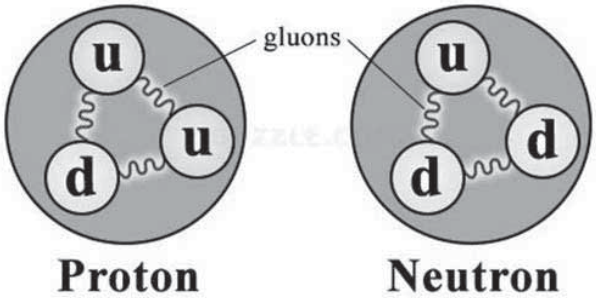

যে ভাবে আপ (ইউ), ডাউন (ডি) কোয়ার্ক আর গ্লুওন দিয়ে গড়ে ওঠে প্রোটন, নিউট্রনের শরীর

তা হলে এবার সার্নের সাফল্যটা কোথায়?

সৌমিত্রবাবু বলছেন, "এলএইচসি-তে এবার সার্ন পদার্থের ওই অদ্ভুত অবস্থাটিই চাক্ষুষ করতে পেরেছে প্রোটন কণাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিয়ে। ৭ টেরা-ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিতে। বিগ ব্যাং-এর এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে যখন হু হু করে ফুলে-ফেঁপে উঠছিল গোটা ব্রহ্মাণ্ড, তখন মোটামুটি ওই পরিমাণ শক্তিরই উদ্ভব হয়েছিল বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান। ওই শক্তিতে প্রোটন কণাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিয়ে কণাদের 'দেহ' থেকে 'আত্মা'কে আলাদা করতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। তৈরি করতে পেরেছেন সেই অদ্ভুত অবস্থা, যার নাম 'কোয়ার্ক-গ্লুওন প্লাজমা'। শুধু তাই নয়, দেখেছেন, সেই অবস্থায় স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক

তিন কণা-পদার্থবিজ্ঞানী। (বাঁ দিক থেকে) বিকাশ সিংহ, ফ্রেডরিকো আন্তিনোরি ও সৌমিত্র সেনগুপ্ত

কণিকাকেও। যা এর আগে শুধুই ভারী নিউক্লিয়াসের পদার্থের পরমাণুগুলির মধ্যে সংঘর্ষে দেখা গিয়েছিল।"

আনন্দবাজারে পাঠানো প্রশ্নের জবাবে জেনিভা থেকে সার্নের 'অ্যালিস' গবেষণাগারের মুখপাত্র ফ্রেডরিকো আন্তিনোরিই-মেলে লিখেছেন, "এবার অ্যালিসে আমরা যেটা দেখেছি, সেটা কোনও

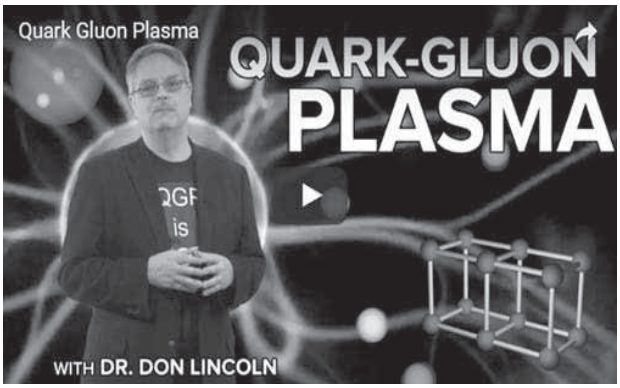

কাকে বলে কোয়ার্ক-গ্লুওন প্লাজমা? দেখুন ভিডিও

তাত্ত্বিক মডেলেই (পড়ুন, স্ট্যাণ্ডার্ড মডেল) বলা ছিল না। আমরা রীতিমতো অবাক হয়ে দেখেছি, ওই প্রচণ্ড শক্তিতে (বিগ ব্যাং-এর পরের এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ে যে শক্তির উদ্ভব হয়েছিল) প্রোটনের সঙ্গে প্রোটন কণাদের সংঘর্ষ ঘটালে অন্য যে কণাগুলি জন্মায়, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আর অনেক বেশি দ্রুত হারে জন্মাচ্ছে কোয়ার্কদের মধ্যে বেশ ভারী স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক।" আরও পড়ুন-এ বার বাতাস থেকে জল টেনেই মেটানো যাবে তেষ্টা। প্রোটনের শরীরে যা নেই, সেই স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক পাওয়া গেল কী ভাবে?

সৌমিত্র বাবুর কথায়– "এটা দু'ভাবে হতে পারে। প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষের ফলে যে কিউজিপি তৈরি হল সেখানে থাকা গ্লুওন কণিকাদের মধ্যে সংঘর্ষ থেকে জন্ম হতে পারে ওই স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্কের। না হলে, কোয়ার্ক ও অ্যান্টি-কোয়ার্কের মধ্যে সংঘর্ষ থেকে জন্মাতে পারে স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক।" ❑

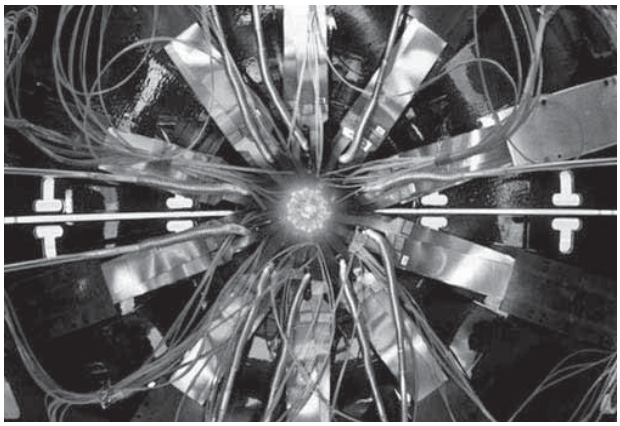

সার্নের 'অ্যালিস' গবেষণাগার (ওপরে), সার্নের ঘোষণা (নীচে)

CERN PRESS RELEASE

New ALICE experiment results show novel phenomena in proton collisions

Geneva 24 April 2017. In a paper published today in *Nature Physics* the ALICE collaboration reports that proton collisions sometimes present similar patterns to those observed in the collision of heavy nuclei. This behaviour was spotted through observation of so-called strange hadrons in certain proton collisions in which a large number of particles are created. Strange hadrons are well-known particles with names such as Kaon, Lambda. Xi and Omega, all containing at least one so-called strange quark. The observed enhanced production of strange particles' is a familliar feature of quark-gluon plasma, a very hot and dense nuclei. But is is the first time ever that such aphenomenon is unambiguously observed in the rare proton collisions in which many in these events.

We are very excited about this discovery, "said Federico Antinori, Spokesperson of the ALICE collaboration. We are again learning a lot about this primordial state of matter. Being able to isolate the quark-gulon-plasma-like phenomena in a smaller and simpler system , such as the collision between two protons, opens up an entirely new dimension for the study of the properties of the fundamental state that our universe emerged from."

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥
[অ : ১৮, শ্লোক : ৩০]

অনুবাদ ঃ হে পার্থ, প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, কর্তব্য (বিহিত কর্ম) ও অকর্তব্য (নিষিদ্ধ কর্ম), ভয়ের কারণ–সংসারপ্রসূ অজ্ঞান এবং অভয়ের কারণ–সংসারনাশক জ্ঞান, সহেতুক বন্ধন এবং সহেতুক মোক্ষ–এই সকল বিষয় যে বুদ্ধির দ্বারা জানা যায়, তাহা সাত্ত্বিক বুদ্ধি। *[অ : ১৮, শ্লোক : ৩০]*

বাংলার তিন রানি

বারিদবরণ ঘোষ

॥ এক ॥

রানি ভবানী

এখনকার বাংলাদেশের রাজশাহি বিভাগের একটি কসবার নাম ছিল ছাতিনগ্রাম। এখানে এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণির জমিদার ছিলেন– আত্মারাম চৌধুরী। তাঁরই পুণ্যবতী-দয়াবতী কন্যা ভবানী– ভবিষ্যতে রানি ভবানী নামে বিখ্যাত হয়ে গল্প-উপন্যাস, কবিতা-ইতিহাসে ঠাঁই করে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে নাটোর রাজবংশের যিনি প্রতিষ্ঠাতা সেই রাজা রামজীবনের পুত্রবধূ হিসেবে ভবানী নাটোরের বিখ্যাত রানি নামেই আমাদের কাছে পরিচিত।

তখন বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ। এক জমিদার দুই গরিব ব্রাহ্মণ ভাইকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করেছিলেন– তাঁদের একজনের নাম রঘুনন্দন, অন্যজন রামজীবন। এই রামজীবন কাজেই রাজার ছেলে ছিলেন না, কিন্তু পরে রাজা হয়ে ওঠেন কী করে– সেই কথাই এখন বলি। রঘুনন্দন বড় হয়ে বাংলার বীরদের অন্যতম বলে পরিচিত হন আর রামজীবন পরিচিত হন বুদ্ধিজীবী হিসেবে। বুদ্ধি দিয়ে নবাব বহুবার হিন্দু জমিদারদের নাজেহাল করতে পেরেছিলেন। এখানে একটা কম-জানা খবর দিই পাঠকদের কাছে। এই যে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ– বাংলার নবাবি ইতিহাসে খ্যাতি-অখ্যাতির চূড়ামণি– তিনি কিন্তু জন্মসূত্রে মুসলমান ছিলেন না। তিনিও একসময় গরিব ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। পরে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান। নিজের পুরানো জীবনের কথা ভেবেই রঘুনন্দন আর রামজীবনদের তিনি মমতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

ভূষণার জমিদার সীতারাম ছিলেন নবাব-বিরোধী। কিন্তু যুদ্ধে তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর কাছে হেরে যান। নবাব তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তার মৃত্যুর পর নবাব সীতারামের জমিদারি রামজীবনকেই দিয়ে দিলেন। তাতেই তাঁর রমরমা বাড়ল। তিনি রাজা হয়ে উঠলেন। রামজীবনের একমাত্র ছেলে কালিকাপ্রসাদ মারা গেলেন ১৭২৪ খ্রিষ্টাব্দে। বাধ্য হয়ে তিনি রসিক রায়ের শিশুপুত্র রামকান্তকে দত্তক নিলেন। তিনি জমিদারির সনদ পেলেন ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে– তিনিই হলেন নাটোর রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা। প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী দয়ারামের বিচক্ষণতায় তাঁর রাজ্য ভালোই চলছিল। এবার তাঁর বিয়ের উদ্যোগ শুরু হল। ঘটনাচক্রে ছাতিন গাঁয়ের আত্মারাম চৌধুরী– কস্তুরীদেবীর মেয়ে ভবানীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল মহাসমারোহে। স্বামীর জমিদারির আয়তন বারো হাজার বর্গমাইল –স্বভাবতই তাঁর রানি

> রাসমণি শুধু রানি নন, ব্যক্তিত্বময়ীও শুধু নন– তিনি স্বদেশপ্রেমিকও। আবার যখন ইংরেজ সাহেব-মেমরা তাঁর রাজবাড়ি দেখতে আসেন– তখন সৌজন্যের এতটুকু ঘাটতি থাকে না। তিনি যে মায়ের জাত, পূর্ণ মমতাময়ীও।

অর্ধবঙ্গেশ্বরী। তিনি যখন কাশীধামে যেতেন তখন বঙ্গদেশে তাঁর পালকি বা বজরা শুধুমাত্র নিজের এলাকা দিয়েই যেত।

বেশ চলছিল রাজা-রানির রাজত্ব। কিন্তু কোথা থেকে নাদির শাহ এসে ভারতের রাজনীতিকে সশঙ্কিত করে দিলে একদিকে, আর অন্যদিকে সুজার মৃত্যুর পর লম্পট সরফরাজ এসে নোংরামির চূড়ান্ত করে দিলেন। এমনকী তিনি জগৎশেঠের পুত্রবধূকে নিজের প্রাসাদে তুলে নিয়ে এলেন। রামকান্তও খুব একটা সচ্চরিত্রের লোক ছিলেন বলা যায় না– যদিও পুজো-আচ্চা, ধ্যান-দানে তার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। এরই মধ্যে বাংলার তখতে বসেছেন আলিবর্দি খাঁ (১৭৪০)। আর মহারাজ নন্দকুমারের চক্রান্তে পড়ে রানি ভবানী রাজ্যচ্যুতা হলেন। আসলে ততদিনে রামকান্তের মৃত্যুতে তিনি বিধবা এবং রাজ্যের অধীশ্বরী। রাজ্য হারিয়ে উপায়ান্তর না দেখে তিনি জগৎশেঠের (জগৎশেঠ কোনও ব্যক্তির নাম ছিল না– ছিল বাদশা-প্রদত্ত উপাধি-নাম) বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। তাঁর কল্যাণেই তাঁর হারানো রাজ্য রানি ফিরেও পেলেন মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে। রানি বিধবা হয়েছিলেন ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে।

রানি রাজ্যভার নিয়ে রাজশাহি রাজ্যকে পূর্ণ গৌরবে স্থাপন করলেন। তাঁর দু'টি পুত্রসন্তান জন্মে অকালে মারা যায়– শুধু কন্যা তারা সুন্দরীকে নিয়েই তাঁর জীবন কাটছিল। মেয়েকে শিক্ষিত করারও নানা আয়োজন করেছিলেন তাঁরা। আলিবর্দিকে নিয়ে তাঁর রাজত্ব চলছিল কোনো ভাবে, কিন্তু পোষ্যপুত্র সিরাজ এসে তাঁর জীবনের ভারসাম্যকে

একেবারে বানচাল করে দিলেন। যদিও তাঁদের গৃহবিবাদে রানি কোনও প্রকার দলাদলিভুক্ত হতে চাননি। সিরাজ চেয়েছিলেন রানিকে তাঁর জমিদারি থেকে উৎখাত করে দিতে। কিন্তু রানি খুব ঠাণ্ডা মাথায় দেওয়ান দয়ারামকে দিয়ে নবাব দরবারের ক্ষমতাশালী পরিষদকে প্রচুর ঘুষ দিয়ে জমিদারিটা রানি ভবানীর নামেই লিখিয়ে নিলেন। সিরাজ যে তাতে রাজি হয়েছিলেন তার কারণ রানির একমাত্র কন্যা তারাসুন্দরী তখন বিধবা হয়ে মায়ের কাছেই ছিলেন– সিরাজ ঠিক করলেন তারাসুন্দরীকে তাঁর হারেমে এনে তুলবেন।

কী করে রানিকন্যা তারাসুন্দরীকে সিরাজের কুনজর থেকে রক্ষা করলেন তা নিয়ে একটি কিংবদন্তি আছে। তাঁকে রক্ষা করেছিলেন নাকি বড়নগরের পূর্বদিকের ভাগীরথীর অপর পাড়ে সাধকবাগের সাধুরাই। তাঁরা নাকি ধর্মকর্ম ছাড়া নানা যোগ-যাগ করতেন, অস্ত্রচালনাও জানতেন। তারাসুন্দরীকে কুরূপা করার জন্য তাঁরা যোগবলে বসন্ত রোগের সৃষ্টি করেন। তাতেই

সিরাজ যাঁদের ধরে নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছিলেন– তাঁরা আসল বসন্ত মনে করে পালিয়ে যায়। আর সুযোগ বুঝে রানিমা মেয়েকে সিরাজের নাগালের বাইরে দূর কাশীধামে পাঠিয়ে দেন।

রানি ভবানী

রানি ভবানীর রাজনীতি ছিল সমঝোতার। বিরোধীদের সঙ্গেও তিনি অকারণ বিরোধিতা না করে অনেক ক্ষেত্রেই এড়িয়ে চলতেন। তাই যাঁরা সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতেন– রানি তাঁদের দলভুক্ত না হয়ে সিরাজকে উপযুক্ত সম্মান দেখানোর জন্য দেওয়ান দয়ারামকে নির্দেশ দিতেন, আর বলতেন– 'খাল কেটে কুমির এনো না।' আবার প্রয়োজনে বিদ্রূপ করতেও ছাড়তেন না। পলাশির যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হলে রানি তাঁদের দলভুক্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে 'শাঁখা-সিঁদুর' পাঠিয়ে বিদ্রূপ করেন।

রানি বিধবা এবং পুত্রহীন, তাঁর মেয়ে তারাসুন্দরীও বিধবা এবং সন্তানহীন। তাই উত্তরাধিকারী স্থির করার জন্য রানি ভবানী ঠিক করলেন তিনি দত্তক পুত্র নেবেন। এই খবর রটে গেলে প্রার্থী শিশুর সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। শেষে একটি শিশুকে তাঁর পছন্দ হল। পরদার আড়ালে রানি তাকে দেখছিলেন। সেই শিশুটি চলে যাবার সময় পায়ের জুতো না পরেই চলে যাচ্ছিল। দয়ারাম তাকে ডেকে জুতো পরতে বললে সে খোশমেজাজে নাকি বলে ওঠে– তুমি আমাকে জুতো পরিয়ে দাও। এই কথা ছোট বাচ্চাটার সারল্য এবং বাদশাহি মেজাজ দেখে রানি তাকেই পছন্দ করেন। এই দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণই তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন।

ততদিনে বাংলার রাজনীতির ছবিটাই বদলে গেছে। এখন বাংলার মালিকের নাম ইংরেজ। কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করেছে। তাঁরা রানির ওপর রেগেই ছিল– সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধে রানি তাঁদের সমর্থন করেননি বলে। তাই এই দত্তক পুত্র নেওয়ার ব্যাপারটা বেআইনি প্রমাণ করার জন্য নানা বাহানা দিতে লাগল। একবার বলে আইনত তাকে দত্তক নেওয়া হয়নি, আবার বলে রানি ফাঁকা হয়ে গেছে– দত্তক পুত্রকে তিনি মানুষই করতে পারবেন না। এতে প্রজারা গেল খেপে। কোম্পানি বাধ্য হয়ে জমা-বন্দোবস্ত করে রানিকে বহাল রাখলেন দত্তক পুত্রসহ। কিন্তু ইংরেজের রাগ যায়নি, ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁকে অভিযুক্ত করে রাজশাহিতে রানির প্রাসাদ অবরোধ করে জুলুম করে বাইশ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে বসেন। 'বিচারের নামে' নন্দকুমারকে হত্যা করে ইংরেজ। রানি ততদিনে বৈরাগ্যের পথে।

ধর্মকর্ম নিয়েই রানি জীবনটা কাটাতে চাইলেন। আর দান-ধ্যানে পুণ্যার্জনই তাঁর ব্রত হয়ে দাঁড়াল। সাধকবাগের সেই সাধুদের আখড়ায় তিনি মাসে ১৪০ টাকা করে সাহায্য করা থেকে শুরু করে কাশীধামে অন্নপূর্ণা মন্দির নির্মাণ করে স্থায়ী কীর্তি স্থাপন করেন। বড়নগরকে তিনি দ্বিতীয় কাশীধাম হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন বলে সেখানে ১১২ টি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কাশীতে একটা পাথরের চৌবাচ্চায় প্রতিদিন আট মন পরিমাণ ছোলা ভিজিয়ে রেখে আগন্তুকদের খাওয়াতেন। অন্নপূর্ণার মন্দিরে বিতরণের জন্য প্রতিদিন ২৫ মন চালের ব্যবস্থা করে দেন। বস্তুত,

কাশীর পুণ্যক্ষেত্র যখন লুপ্তপ্রায়, তখন তার পুনরুদ্ধার করে তাকে প্রাচীন গৌরবের কালে ফিরিয়ে দেওয়ার অক্ষয়কীর্তিতে রানি ভবানী বঙ্গদেশকে কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন। কত পথঘাট নির্মাণ ও সুসংস্কার, কত জীর্ণ মন্দির সুসংস্কার, কত মন্দিরে নিত্য দেব সেবার বন্দোবস্ত করার নিদর্শন হয়তো নাটোরে এখনও গেলে দেখা যাবে। মুর্শিদাবাদের পুণ্যকীর্তিস্থল প্রায় বিলুপ্ত। স্বক্ষেত্রে এবং অন্যত্র কত জলহরি (জলের পুকুর) তিনি যে নির্মাণ করেছিলেন– তার দলিলও আমরা দেখেছি। শোনা যায় এক কাশীধামেই তিনি প্রায় ৩৮০টি দেব মন্দির নির্মাণ ও সংস্কার করেন। তারপরে সবার জীবনে যা ঘটে, রানি ভবানীর জীবনেও তা অনিবার্য হয়ে পড়ল। রাজকার্যের সমস্ত সংস্রব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এই পুণ্যবতী কন্যা তারার কাছে গঙ্গা তীরবর্তী বড়নগরেই কাটাতে কাটাতে প্রায় লোকচক্ষুর অগোচরে পৃথিবী ত্যাগ করে পুণ্যধামবাসিনী হয়ে গেলেন। তাঁর প্রয়াণ দিবসটি আমরা স্পষ্ট করে জানতে পারিনি। সালটি ছিল ১২০০ বঙ্গাব্দ। বুঝিবা অগৌণে তাঁর অকৃতকার্য অগীত গান এবং অকথিত বাণী উচ্চারণের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন রানি রাসমণিকে।

ঘটনাচক্রে এই ১২০০ বঙ্গাব্দেই রাসমণির জন্ম হল। আশ্চর্য সমাপতন।

॥ দুই ॥

রানি রাসমণি

দেখতে দেখতে ২২২টা বছর পার হয়ে গেল। আর তিন বছরের মধ্যে বাঙালি তাঁর ২২৫তম জন্ম-জয়ন্তী পালনের জন্য উঠেপড়ে লেগে যাবে। ১২০০ বঙ্গাব্দের এমনি এক আশ্বিন মাসের

এগারো তারিখে একটি শিশুকনার জন্ম-মুহূর্তে কান্নার আওয়াজ পেয়ে হরেকৃষ্ণ দাসের আর তর সয়নি– লোকলজ্জা ভুলে সোজা ঢুকে গিয়েছিলেন আঁতুড় ঘরে। কিন্তু নবজাতিকাকে দু'নয়ন ভরে দেখার আগেই বোন ক্ষেমঙ্করী এসে দাদার হাত ধরে টেনে ঘরের বাইরে বের করে দিয়ে বললে– দাদা, তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ, এখন এ ঘরে পুরুষদের ঢুকতে নেই। মিন্‌সের কাণ্ডকারখানা দেখে স্ত্রী রামপ্রিয়া পর্যন্ত লজ্জায় কুঁকড়ে এতটুকু! দু'টো ছেলের পর মেয়ে জন্মেছে– হরেকৃষ্ণ আনন্দে ডগোমগো। ক্ষেমঙ্করী যখন বলল– তোমার আদিখ্যেতা দেখে বাঁচিনে দাদা, ছেলে তো হয়নি– মেয়ে হয়েছে তাতেই তোমার এত...।

মায়ের পেটের একটা বোন পর্যন্ত এমনি করে বলছে। হরেকৃষ্ণর পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে সরে যাচ্ছে। বিহ্বল হয়ে তিনি পড়শিদের বাড়িতে গিয়ে বললেন– সবাই আনন্দ করো গো– শাঁখ বাজাও, উলু দাও, আমার ঘরে আমার মা ফিরে এসেছে গো! গোটা কৈবর্তপাড়া তাঁর আনন্দ দেখে গালে হাত দিয়ে বসে। মেয়ে হলে এতই আনন্দ হয়! হালিশহরের কোনা গ্রামের হরেকৃষ্ণ দাসের বাড়িতে চাঁদের টুকরোর জন্ম হয়েছে। রামচন্দ্র আর গোবিন্দের পর মায়ের কোল আলো করে এল রাসমণি। তাতেই

তো কোনা গ্রামের মাটি এত পবিত্র হয়ে গেল।

ওদিকে আদি কলকাতার গোবিন্দপুরের একফালি গ্রামে জন্ম হয়েছিল যে প্রীতিরামের (নাকি হিন্দুস্থানি উচ্চারণে ডাকব প্রীতিরাম বলে!) সে কিন্তু বড় হচ্ছিল দুই জমিদার ভাই যুগল আর অঙ্কুর আর তাঁদের অভিভাবক বিন্দুবালা পিসির স্নেহের তত্ত্বাবধানে। ছোট্ট প্রীতিরামের কচি আকু মায়া মাখা মুখখানা দেখে নিরাশ্রয় ছেলেটাকে খোশালপুর থেকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন বিন্দুবালা– ভাইপোদের বলেছিলেন বাড়ির একপাশে শোবে, যা হোক কিছু খেতে দেব ওকে। ভাইপোরা আপত্তি করেননি।

প্রীতিরাম একটু করে বড় হয়ে উঠছেন। এখন তাঁর বেঁচে থাকার জন্য একটা কাজ চাই। পিসিমা তাঁকে জমিদারির সেরেস্তার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। খুব আনন্দ হয়েছিল তখন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে একটা বাইরের কাজ চাই। একদিন অক্রুর মান্না– তাঁর অক্রুর দাদা কথায় কথায় ডান্‌কিন বলে এক সাহেবের নাম বলেছিলেন।

– ডানকিন সাহেব– তিনি কে দাদা?

– সে কী রে! ডানকিন সাহেবের নাম জানিসনে– তিনি একজন বিরাট ব্যবসাদার। ইয়া বড় বড় তাঁর লবণের গোলা– নুনের আড়ত। জাহাজে করে নুন এনে আড়তে রেখে দেশের লোকের কাছে পাইকারি হারে বিক্রি করে। আর তাতেই লাখ লাখ টাকা!

লাখ লাখ টাকা! প্রীতিরাম টাকা কী জিনিস, কত টাকায় লাখ লাখ টাকা হয় জানেই না। কিন্তু ইচ্ছে হল– তাঁরও লাখ লাখ টাকা চাই। তাই দাদাকে ধরে বসলেন– তোমার সঙ্গে সাহেবের এত জানা-চেনা দাও না সাহেবকে বলে আমাকে একটা কাজ পাইয়ে। তো একদিন অক্রুর মান্না প্রীতিরামকে নিয়ে ডানকিন সাহেবের অফিসে হাজির। সাহেবের নানান ব্যবসা। নুনের গোলা তো আছেই– বাঁশের ব্যবসাতেও তাঁর রমরমা। আবার নানান জিনিস নিলামে কিনে তা চড়া দামে শৌখিন মানুষের কাছে বিক্রির ব্যবসাও বেশ ফুলে-ফেঁপে ওঠা। কিন্তু মান্না বাড়ির কিশোরী মেয়েটাকে ছেড়ে প্রীতি যাবেন কোথায়। কিন্তু মান্না বাড়ির জামাই হতে গেলে তো নিজের এলেমটা চাই-ই চাই।

তাই নানা ব্যবসায় প্রীতিরাম নেমে পড়লেন। কখনও লাভ, কখনও লোকসান। একবার তো যশোরে চলে গেলেন এক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চাকরি করতে। ঢাকায় থাকতে থাকতেই প্রীতিরামের ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল যখন একদিন নাটোরের রাজা রামকান্ত রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে গেল। রাজা তাঁকে তাঁর রাজ্যের দেওয়ান করে দিতে চাইলেন। প্রীতি কাজে যোগ দিলেন, কিন্তু রাজার মৃত্যুর পর কিছুতেই আর নাটোরে থাকতে পারলেন না। ফিরে এলেন কলকাতায়। ততদিনে যুগলকিশোরের মেয়ে যোগমায়া বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছেন। তাঁর সঙ্গে প্রীতিরামের বিয়ে হল খুব ধুমধাম করে।

যুগল বললেন– প্রীতি আজ থেকে আমার জামাই নয়, আমার ছেলে হল। একটা কাগজে দানপত্র লিখে প্রীতির হাতে তুলে দিলেন– ষোলো বিঘে এক ছটাক জমি কলকাতার বুকে। জানবাজারে বিশাল বাড়ি তুললেন প্রীতিরাম। তারপরে শ্বশুর মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে যোগমায়াকে নিয়ে এসে তুললেন জানবাজারের প্রাসাদে। কিছুদিন পর তাঁর কোল আলো করে জন্মালেন তাঁদের প্রথম পুত্র হরচন্দ্র। কিন্তু তিনি নিঃসন্তান হয়ে রইলেন। ছোটছেলে রাজচন্দ্র।

এই রাজচন্দ্রও একসময় বড় হয়ে উঠলেন– সুপুরুষ জোয়ান। তাঁকে দেখে একদিন যোগমায়ার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন– রাজচন্দ্রের বিয়ে দেবেন। বিয়ে দিলেনও সমারোহ করে। কলকাতা তাকিয়ে দেখল সেই জৌলুস। কিন্তু বিয়ের রাতে যে রাগিণীতে সানাই বাজে, 'সে রাগিণী চিরদিনের নহে।' বিয়ের মাত্র ক'মাস পরেই রাজচন্দ্র বিপত্নীক হলেন। কিছুদিন পর আবার ছেলের বিয়ে দিলেন প্রীতিরাম এবং একই পরিণাম। গোটা সংসার জুড়ে কেবল বিষাদের ভৌতিক ছায়া।

আপনি পিছন পিছন আসুন– আমি আগে আগে যাই– কিশোরী মেয়েটার মিষ্টি গলার এই আহ্বানে প্রীতিরাম আর তাঁর নায়েবের চোখে জল টলটল। এতদিনে তবে কি সংসারবিবাগী প্রীতিরাম একটা আশ্রয় পাবেন এবং পুত্র রাজচন্দ্রও মেয়েটির পিছনে পিছনে আসতে আসতে প্রীতিরামের সেই কথাই মনে হচ্ছিল বার বার। সন্ধে নেমেছে, রামায়ণ পাঠ শেষ করে পুস্তকে মাথা ঠেকিয়েই দেখতে পেলেন রাসমণি, শ্রীরাধার এই নামেই মেয়ের নাম রেখেছিলেন হরেকৃষ্ণ, এসে দাঁড়িয়েছে।

– এই ভর সন্ধেতে তুই কোথায় গেছিলি মা... কথা শেষ করার আগেই দেখলেন মেয়ের পিছনে দুই ভদ্রলোক বৃদ্ধ নায়েবমশায়

জিজ্ঞেস করলেন– এই কিশোরী কন্যার পিতা আপনিই... সঙ্গে ইনি কলকাতার জানবাজারের জমিদার শ্রীযুক্ত প্রীতিরাম দাস।

– কী সৌভাগ্য আমার, বসুন বসুন আপনারা।

– হ্যাঁ আপনি জমিদার, কিন্তু পৃথিবীতে আমার চেয়ে দীন আর কেউ নেই– প্রীতিরাম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন। তাই ভিক্ষা চাইতে এসেছি। এসেছিলাম হালিশহরে, রামপ্রসাদের ভিটেতে বসে আছি, এই মা-টিকে দেখতে পেলাম সেখানেই। ও-ই পথ দেখিয়ে আপনার কাছে নিয়ে এল।

একটা প্রতিজ্ঞা মনে মনে স্থির করে প্রীতিরাম ফিরে এসেছিলেন জানবাজারের বাড়িতে। যোগমায়াকে বলেছিলেন সব কথা। রাজচন্দ্র বিবাগী প্রায়। সে গেছে ত্রিবেণীতে মনে শান্তি পেতে। সে ফিরে এলে আবার সাহস করে ছেলেকে সংসার পাতার কথা বললেন। আনমনে রাজচন্দ্র রাজি। আবার কি একটা বধুর মৃত্যুর সাক্ষী হতে হবে তাঁকে।

কয়েকটা দিন বাড়িতে থেকেই আবার রাজচন্দ্র বের হয়েছেন হালিশহরে রামপ্রসাদের ভিটে দেখবেন বলে। সেখানে গঙ্গার ঘাটে দেখলেন এক দশমী কিশোরীকে। বন্ধুদের বলছিলেন– বাবা

আবার বিয়ে করতে বললেন– এই মেয়েটার মতো যদি একটা পাত্রী পেতাম...।

তো সেকথা শুনে প্রীতিরাম ঘটক পাঠালেন। ঘটক ফিরে কনের বাড়ির আর কনের খোঁজখবর দেবার আগেই প্রীতিরাম সবিস্তারে সব কথা বলে দিলেন। ঘটক মহাশয় থ। অতএব ৮ বৈশাখ ১২১১ বঙ্গাব্দ, সাড়ে দশ বছরের রাসমণির বাড়ির ঠিকানা বদল হল– কোনা গ্রাম থেকে জানবাজারে। বিয়ের আসর বসেছে চার নম্বর গোয়ালটুলির বিশাল বাড়িতে– ধর্মতলার মোড় থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের দিকে আসবার পথে একটা বিশাল স্টোর ছিল এককালে– নাম ছিল কমলালয় স্টোর্স। সেটা এখন স্মৃতি। ওটাই ছিল গোয়ালটুলিতে বিয়ে বাড়ির ঠিকানা।

জানবাজারের বাড়িতে একদিন এক সন্ন্যাসী এসে একান্তে নববধু রাসমণির সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন একটি শিলাখণ্ড রঘুনাথের মূর্তি। শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী-পরিবারের চূড়ামণি হয়ে রাসমণির নয়নমণি হয়ে রইলেন আরাধ্য রঘুনাথ– তাঁর সমস্ত সম্পদে-বিপদের আশ্রয়। প্রীতিরাম মাড়কে জানবাজারের সাধারণ মানুষ রাজা বলেই ডাকতেন। রাজচন্দ্র তাঁর ছেলে– নামে এবং গৌরবে তিনিও রাজা। রাসমণি তাই রানি - রানি রাসমণি। রানি এলেন, প্রীতিরামের সম্পদ বাড়তে লাগল বহুগুণে।

কিন্তু একটা বেদনা জানবাড়ির মানুষজনদের জড়িয়ে জড়িয়ে ধরেছে। সে বেদনা প্রীতিরামের এক রকমের, রাজচন্দ্রের অন্য রকমের এবং রাসমণির তো ভিন্ন প্রকৃতিরই। একটি পুত্রসন্তানের জন্য আকাঙ্ক্ষা এই রাজপরিবারের ছিলই এবং সেটা স্বাভাবিকই। বংশরক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষার দায় আমাদের সমাজে এখনও পুত্রসন্তানেরই। কন্যারা সেই অধিকার পেলেও তা কার্যকরী হয় না। রাজচন্দ্র রাসমণি জানবাজারের রাজবাড়িতে সেই বংশধরকে উপহার দিতে পারেননি। দুটি কন্যাসন্তান (পদ্মমণি আর কুমারী) জন্ম দেওয়ার পর রাসমণি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন বটে কিন্তু সে বাঁচেনি– শৈশবেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তারপর পুনশ্চ আবার দুটি কন্যা (করুণাময়ী এবং জগদম্বা)। জামাতারা এসেছেন, পরিবারে ভালোমন্দর সঙ্গে জড়িয়েও পড়েছিলেন তাঁরা। বিশেষ করে কনিষ্ঠ জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাস জামাতা থেকে ছেলেই হয়ে উঠেছিলেন। রাসমণি তাঁর রঘুনাথকে আশ্রয় করে সান্ত্বনা পেতেন কিনা বলতে পারব না। কিন্তু এই শূন্যতা হাহাকার করত জানবাজারের খোলা বাতায়ন আর পেল্লায় দরজার খড়খড়ির ফাঁকগুলোতে, রাসমণির শূন্যতা পূর্ণ হয় রাজকোষকেও শূন্য হতে দেখলে। রাজচন্দ্র অকাতরে প্রার্থীজনকে যত অর্থ বিতরণ করেন রাসমণির আত্মা যেন ততই পরিতৃপ্ত হয়। রূপে-গুণে রামমণি সত্যি রানি।

রানি রাসমণি

আজকের যে ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা জাতীয় গ্রন্থাগার– সেটার আস্তানা তখন মেটকাফ হলে স্ট্যাণ্ড রোডের ওপরে। রাজচন্দ্র সেই পাঠাগারের খবর দিয়ে রাসমণিকে অবাক করে দেবার আগেই রাসমণি বলে উঠলেন– ওর কথা শুনেছি বইকি, দেশের অনেক বড় বড় মানুষ তাতে চাঁদা দিচ্ছেন। তুমিও দাও না গো বই কেনা আর বাড়ি করার জন্যে টাকা। একগাল তৃপ্তির হাসি হেসে রাজচন্দ্র দিয়ে এলেন দশটি হাজার টাকা। হিন্দু কলেজে গরিব-মেধাবী ছেলেরা টাকার অভাবে পড়তে পারছে না– রাজচন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে টাকা তো দিয়েই ছিলেন– দশজন গরিব মেধাবী ছেলের সম্পূর্ণ খরচ-খরচাও তিনিই বহন করেছিলেন।

এমনি করেই চলছিল। কিন্তু 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়'। হঠাৎ করে ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজচন্দ্র অস্তমিত হলেন– রাসমণি 'চন্দ্র'হীন হয়ে যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়লেন। কীর্তিমতী পত্নী আর নগদ ৬৮ লক্ষ টাকা, প্রাসাদ এবং আরও কিছু সঞ্চয় রেখে রাজচন্দ্র চলে গেলেন। কিন্তু রানির তো ভেঙে পড়লে চলবে না। স্বামীর অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করাই এখন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। তাই স্বামীর শ্রাদ্ধে তাঁর আয়োজনের তালিকায় বিশেষ করে লেখা হল– 'একটা অনাথ-আতুর-গরিব-ভিখারি যেন ফিরে না যায়।'

তুলাদানের ব্যবস্থা হল– দাঁড়িপাল্লার একদিকে বসলেন রাসমণি– অন্য পাল্লায় রুপোর টাকা দিয়ে তাঁকে ওজন করা হল। লাগল ৬০১৭টি রুপোর টাকা। সেই টাকা মুঠো মুঠো করে নিয়ে তিনি ব্রাহ্মণদের দান করলেন। সবই করছেন, কিন্তু তা যেন নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে। কতদিন কতবার আপন মাঝে আত্মহারা হয়ে তিনি যেন জগৎবাসিনীই নন। স্বামী অবশ্য মেয়ে তিনটির বিয়ে

দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে করুণাময়ী যেদিন চলে গেল বিয়ের দু'টো বছর পার না হতেই– সেও চলে গেল। সে শোকও স্বামীকে দেখে সহ্য করেছিলেন রানি। তার মনে হঠাৎ করে ভরসা দিতে এলেন যেন নাটোরের রানি ভবানী। অমনি বুক বেঁধে চলে এলেন কাছারি বাড়িতে। জামাই মথুরা সব সময়েই পাশে আছে বটে, কিন্তু জমিদারি সামলাতে হবে তাঁকেই। রাজচন্দ্র বেঁচে থাকতেই দ্বারকানাথ ঠাকুর এসে দু'লক্ষ টাকা কর্জ করে নিয়ে গিয়েছিলেন– সেই টাকা আদায়ের জন্য দ্বারকানাথের কাছে চিঠি পাঠালেন স্বামীর জন্যে। কিন্তু ঠাটবাট রাখতে হবেই। কাঠের রথ বদলে রুপোর রথ তৈরি করালেন। রথে, দোল-দুর্গোৎসবে রানিমা উদারহস্তা।

এই দুর্গাপুজো নিয়েই হাঙ্গামাটা তো কম বাঁধল না রানিমার আমলে। তখন জানবাজারে ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গোরা সেনাদের ব্যারাক। তারা তো ভারতীয়দের পা-চাটা কুকুর ছাড়া ভাবত না। একরাতে তাঁদের ঘুম ছুটে গিয়েছিল পঞ্চাশটা ঢাকের পৃথিবী কাঁপানো আওয়াজে। দুর্গার নবপত্রিকার স্নান করানোর জন্যে জুলুস যাচ্ছে গঙ্গার ঘাটে, তারই আয়োজনে এই ঢাকের সমারোহ। রাত-দুপুরে ঘুম ভেঙে লালমুখোরা তো রেগে খ্যাপচুরাস। তারা ফরমান দিলে– ডোন্ট প্রসিড, দিস ইজ ইললিগ্যাল প্রসেসান। আনহেলদি সাউণ্ড– এক পা এগিও না, এই শোভাযাত্রা বেআইনি। মথুরামোহন কত বোঝাবার চেষ্টা করলেন– এটা পুজোর আবশ্যিক অঙ্গ। কে শোনে কার কথা। ব্যারাক থেকে সঙিন উঁচিয়ে তারা তেড়ে এল। রানির কাছে খবর গেল।

তিনি বলে পাঠালেন।– পুজো বন্ধ হবে না, ওরা গুলি চালালে আমাদেরও গুলি চালাতে হবে– পাইক বরকন্দাজদের খবর দাও।

অমনি বেজে ওঠল আরও জোরে পঞ্চাশটা ঢাক সারা কলকাতার বুক কাঁপিয়ে। শুনে সাহেবরা বিড়বিড় করল ওদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু গলায় যেন সে জোর নেই। রানি মা বলে পাঠিয়েছেন– আদালতে বোঝাপড়া হবে। দলিলের নকল পাঠিয়েছেন তিনি– দেখা গেল তাতে গোটা রাস্তাটাই রাসমণির খাস দখলে। জোঁকের মুখে নুন পড়ল। রানি মা মামলা জিতলেন। তবে বিচারক ইংরেজের মুখরক্ষার জন্যে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করলেন। রানি মা মুখ টিপে হেসে মথুরামোহনকে জরিমানা দিতে বলে দিলেন। রাসমণি শুধু রানি নন, ব্যক্তিত্বময়ীও শুধু নন– তিনি স্বদেশপ্রেমিকও। আবার যখন ইংরেজ সাহেব-মেমরা তাঁর রাজবাড়ি দেখতে আসেন– তখন সৌজন্যের এতটুকু ঘাটতি থাকে না। তিনি যে মায়ের জাত, পূর্ণ মমতাময়ীও।

তবে তিনি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর স্বজাতি ধীবরজাতির পাশে দাঁড়িয়ে। একদিন তাঁরা দলবদ্ধভাবে এসে দাঁড়িয়েছেন রাজবাড়ির সামনে সোজা দক্ষিণেশ্বর থেকে। তাঁরা এসে মথুরামোহনকে বললেন ইংরেজরা তাঁদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার করছে, তাদের জাল কেড়ে নিচ্ছে, মাছ ধরতে না পেয়ে তাঁদের পেটে আজ অন্ন নেই। রানিমা একটা বিহিত করুক। সব শুনে রানিমা মথুরামোহনকে খোঁজ নিতে বললেন ঘুসুরি থেকে মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত গঙ্গার জন্য কত টাকা পেলে ইংরেজ সরকার নিয়ে তা ইজারা দেবে। চাহিদার দশ হাজার টাকা মিটিয়ে দিয়ে রানি সমস্ত গঙ্গাটা লোহার জাল দিয়ে ঘিরে দিলেন। ইংরেজের নৌকো জলযান আর তা পার হয়ে যেতে পারে না। ইংরেজের টনক নড়ল– তারা যেমন কুকুর, রানি তেমনি মুগুর। বাধ্য হয়ে ইংরেজ রফা করতে রাজি হল। গঙ্গায় জেলেদের মাছ ধরার অবাধ অধিকার দিয়ে তারা বাণিজ্য করে বাঁচল।

জেলেরা গান বাঁধল–

ধন্য রানি রাসমণি রমণীর মণি।
বাঙ্গলায় ভাল যশ রাখিলে আপনি ॥
দীনের দুঃখ দেখে কাঁদিলে আপনি।
দিয়ে ঘরের টাকা পরের জন্যে বাঁচালে প্রাণী ॥
যে যশ রাখিলে তুমি হইয়া রমণী।
ঘরে ঘরে তোমার নাম গাইল দিবস রজনী ॥

তারপর সেই দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার মনোহর কহানিয়া। বিশাল কর্মযজ্ঞ দেবতার প্রতিষ্ঠা, কামারপুকুরের গদাধর চাটুজ্যেকে পুরোহিত নিয়োগ ১২৫৪ থেকে ১২৬২ আট বছরের দেবসাধনা ন'লক্ষেরও বেশি কিছু টাকার বিনিয়োগে মূর্তিমান হয়ে উঠল। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৬২ সন– পুণ্যস্নানযাত্রায় মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল। গণ্ডগ্রাম হয়ে উঠল গণ্যগ্রাম। জেমস হেষ্টির কুঠিবাড়ি, গাজি পীর সাহেবের কবরখানা– জাত বিচার নেই। রানির আনন্দের অবধি নেই, ছোট ভটচাজ মায়ের মূর্তি গড়েন নিজের হাতে।

আর কেন? সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়তে হবে। সব বন্ধন খুলে খুলে যায়। রানির আর আকর্ষণ নেই কিছুতেই। এখন ব্রহ্মলীন হবার সময়। মাতা রাসমণি মায়ের কোলেই চলে গেলেন।

রাসমণি যখন ব্রহ্মলীন হয়েছিলেন ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে তখন স্বর্ণময়ী নন্দীর বয়স ৩৪।

॥ তিন ॥

মহারানি স্বর্ণময়ী

১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে রাসমণি যখন মারা গেলেন তখন স্বর্ণময়ীর বয়স ৩৪। রানি ভবানীর মতোই স্বর্ণময়ীর জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটে গিয়েছিল যে মনে হয় একজন যেন অন্যজনের জীবন নকল করে চলেছিলেন। স্বর্ণময়ী জন্মেছিলেন বর্ধমান জেলার ভট্টকুল বা ভাটাকুল গ্রামে ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে। ছেলেবেলায় বাপ-মা তাঁর নাম রেখেছিলেন সারদাসুন্দরী। তিনি সত্যিই সারদার মতো সুন্দরী ছিলেন। তাঁকে বয়সকালে মনে হত দেবকন্যা। তাঁর যখন বিয়ে হয়, একটু বেশি বয়সেই বলা চলে সেকালের নিরিখে, তাঁর বয়স তখন এগারো। পাত্র কাশিমবাজারের কৃষ্ণনাথ নন্দী। তিনি নিজেই দেখে তাঁর পাত্রী পছন্দ করেছিলেন। বিয়ের পরেই সারদাসুন্দরী নাম বদলে যায়– তিনি পরিচিত হন স্বর্ণময়ী নামেই। বিয়ের পরেই তাঁর দুটি মেয়ে হয় লক্ষ্মী আর সরস্বতী। লক্ষ্মী অল্প বয়সেই মারা যান। সরস্বতীর বিয়ে দেন স্বর্ণময়ী এক অভাবী ছেলের সঙ্গে আর

তাঁকে ঘরজামাই করে রাখেন। কিন্তু বিয়ের অল্পকালের মধ্যে কন্যার মৃত্যু হয়। স্বর্ণময়ী জামাইকে আবার বিয়ে করতে অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি রাজি না হয়ে স্বর্ণকুমারীর ব্যবস্থায় জীবনপাত করেন। এদিক থেকে কন্যার জননী রানি ভবানী এবং রানি রাসমণির জীবনের সঙ্গে স্বর্ণময়ীর এক আশ্চর্য মিল ছিল। কেউই পুত্রসন্তানের মাতা হিসেবে গৌরববতী হতে পারেননি।

যে কৃষ্ণনাথের সঙ্গে সারদাসুন্দরীর বিয়ে হয়, সেই কৃষ্ণনাথের পূর্বপুরুষ কান্তবাবুরা একসময় বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অধীন রিপি বা সিজনা গ্রামে বাস করতেন। ব্যবসার কারণে তাঁরা মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারের শ্রীপুরের অধিবাসী হন। সেখানেই পরে রাজবাড়ি গড়ে ওঠে। জাতি ব্যবস্থায় তাঁরা তিলি ছিলেন, অনেকে তাঁদের তেলি বলে (Oilman) চিহ্নিত করে গেছেন– তা ঠিক নয়। কান্তবাবু সামান্য বাংলা, ফার্সি আর ইংরেজি শিখেছিলেন। বলা হয় যে তিনি দু'হাজার ইংরেজি শব্দ মুখস্থ করেছিলেন। প্রথমে তিনি ইংরেজের কুঠিতে মুহুরির কাজ করতেন, পরে রেশমের ব্যবসায় অর্থবান হন। এসময়ে তিনি অদ্ভুতভাবে হেস্টিংসকে অনুকূল করে পরে তাঁর আনুকূল্য পান। সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের একেবারেই বনিবনা ছিল না। বহু ইংরেজকে তিনি হত্যা করেন। তাঁর ভয়ে ওয়ারেন প্রাণে বাঁচবার জন্যে একবার এই কান্তমুদির দোকানে আশ্রয় নেন। পরে তিনি সুদিন ফিরে পেয়ে কান্তবাবুকে ভোলেননি। হেস্টিংসের দেওয়ানি করে তিনি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হয়ে পড়েন– জমিদারির আয় ছিল চার লক্ষ টাকা। বঙ্গদেশ ছাড়া উত্তর প্রদেশের বালিয়া, আজিমগঞ্জেও বিস্তৃত হয়েছিল তাঁর জমিদারি। তাঁর ছেলে লোকনাথ এবং লোকনাথ-পুত্র হরিনাথের মতো হরিনাথ পুত্র কৃষ্ণনাথও 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। ১৮৩৮ সালে তাঁর বিয়ে হয়। কথায় বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন– কে জানে স্বর্ণময়ীর কপালেই বিয়ের দু'বছরের মধ্যে কৃষ্ণনাথকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন লর্ড অকল্যাণ্ড। কিন্তু স্বর্ণময়ীর বিবাহিত জীবন দীর্ঘ হল না– বিয়ের ৬ বছর পরে তাঁর ১৭ বছর বয়সে তিনি বিধবা হলেন এক অভাবিত ঘটনায়। কৃষ্ণনাথ দানশীল, তেজস্বী এবং সাহসী ছিলেন। ইংরেজদের পর্যন্ত খুব একটা পাত্তা দিতেন না। ১৮৪৪ সাল। একটা ফৌজদারি মামলায় তাঁকে সোপার্দ করে আদেশ দেওয়া হয় আদালতে হাজিরা দিতে। পাছে সেখানে গিয়ে তিনি অপমানিত হন– সেই ভয়ে কৃষ্ণনাথ গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করে বসলেন– স্বর্ণময়ীর স্বর্ণালি দিনগুলিতে ঘটে অবাঞ্ছিত যতিপাত।

মহারানি স্বর্ণময়ী

কৃষ্ণনাথের মৃত্যুর জন্যে কি ওত পেতেছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। অচিরাৎ তাঁরা নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নিল তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি, কারণ তিনি পুত্রহীন এবং একটি অদ্ভুত উইল তারা আদালতে পেশ করল– কৃষ্ণনাথ সেই উইলে নাকি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি দান করে গেছেন কোম্পানিকে। এই সময় রানির পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁর দুই শুভানুধ্যায়ী শ্রীরামপুরের অ্যান্টনি হরচন্দ্র লাহিড়ি এবং তাঁদের জমিদারির দেওয়ান ঢাকার রাজীবলোচন। তিনি উইল-এর নির্ভরতায় সন্দেহ প্রকাশ করে স্বর্ণময়ীকে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটা মামলা রুজু করে দিলেন। আইনি লড়াই চলল টানা তিন বছর ধরে। শেষে প্রমাণিত হল যে, 'কৃষ্ণনাথের ইউল বিকৃত মস্তিষ্কের কার্য'। আদালত রানি স্বর্ণময়ীকে সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। সম্পত্তি ফিরে পেলেন বটে, কিন্তু সে এক লণ্ডভণ্ড অবস্থায়। এই তিন বছরে যাঁদের হেফাজতে সম্পত্তি ছিল তাঁরা বেহাল অবস্থা করে ছেড়েছিল। ধন্যবাদ রাজীবলোচনকে। তাঁর কৃতিত্ব, বুদ্ধিমত্তায় সমস্ত ঋণ পরিশোধ করা তো হলই, জমিদারির আয় বাড়িয়ে তার পরিমাণ করে দিলেন বত্রিশ লক্ষ টাকা। তার চেয়েও বড় ব্যাপার স্বর্ণময়ীকে দিলেন এক নতুন ব্রতের শিক্ষা– দয়াব্রত। তাঁরই পরামর্শে রানির মধ্যে ঘটে গেল আমূল পরিবর্তন। প্রতিদিন অন্নহীনদের জন্যে বরাদ্দ হল ২৫ মন তণ্ডুল। অর্থী আর ব্রাহ্মণদের নানা দানের ব্যবস্থা হল, এমনকী পশু-পাখিরাও বঞ্চিত হল না রানির বরাদ্দ থেকে।

রানিমাও সুযোগ পেলেই কম্বল, শাল বনাত ইত্যাদি উপহার দিতেন। দান করতেন পুজোপার্বণে। বোয়ালিয়াতে মেয়েদের জন্যে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন হয়েছে শুনে খুশি হয়ে স্বর্ণময়ী একলপ্তে দু'শো টাকা পাঠিয়ে দিলেন। এমন হাজারো দানের তালিকা বলে শেষ করা যাবে না। রানির এই বদান্যতা ইংরেজ সরকারেরও ভালো লেগেছিল। সেকারণে ১৮৭১ সালে সরকার তাঁকে মহারানি এবং পরে তাঁকে 'ক্রাউন অব ইণ্ডিয়া' উপাধিতে ভূষিত করে তাঁকে উৎসাহিত করেন। শুধু তাঁকে নয়, তাঁর প্রেরণাদাতা রাজীবলোচনকেও দেওয়া হয় 'রায়বাহাদুর' উপাধি। তাঁর মৃত্যুর পর 'বামাবোধিনী পত্রিকা' যে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশ করেন তাতে মহারানির দানের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা সংযুক্ত করে দেন। আমরা তা থেকে তুলে দিয়ে এই সেবাময়ী দানব্রতা রমণীর হৃদয়ের প্রসারতার একটুখানি গুণগ্রাহিতা প্রকাশ করি।

বহরহমপুরে জলের কল স্থাপনের জন্য দেড় লক্ষ, উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষে সাহায্যকল্পে সোয়া লক্ষ, মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রী নিবাস নির্মাণের জন্যে এক লক্ষ, কলিকাতা চিড়িয়াখানাকে দেন চৌদ্দো হাজার, দশ হাজার করে দেন কাম্বেল স্কুলের ছাত্রীনিবাস ও কলিকাতা কুমারী মিলম্যান ফিমেল স্কুলে, রাজশাহি মাদ্রাসা পায় পাঁচ হাজার, আট হাজার পায় কলিকাতা দুর্ভিক্ষসভা, চট্টগ্রামের ইংরাজ নাবিক নিবাসও পায় তিন হাজার, একই পরিমাণ পায় কলিকাতা ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুল। দেড় হাজার টাকা করে পায় বেথুন স্কুল এবং সিটি কলেজ, মেওয়া হাসপাতাল এবং রংপুর হাইস্কুলের জন্য বরাদ্দ যথাক্রমে আট এবং চার হাজার টাকা। চার হাজার পায় হিন্দু আনুয়িটি ফাণ্ড, এমন কী উড়িষ্যায় কটেক কলেজ পায় দু'হাজার টাকা। লক্ষ্য করার বিষয়– দানের বিষয়ে তিনি জাতি-ধর্মের বিচার করেননি।

এত দান, কিন্তু জীবন-যাপনে এবং স্বভাবে তিনি অতি সাধারণ। সামান্য ও সাধারণ খাবার খেতেন। শুতেন সাধারণ শয্যাতে। ধর্মচর্চা ও রাজকার্য– দু'টিতেই ধ্যানমগ্না, মগ্ন হতেন পুস্তক পাঠেও। নিজে পড়তেন না শুধু– নানা সংবাদ ও সাময়িকপত্র পাঠযোগ্য বিষয়গুলি চিহ্নিত করে তিনি সেগুলি পাঠের জন্যে কর্মচারীদের কাছেও পাঠিয়ে দিতেন।

এমন মানুষকেও চলে যেতে হয়। তাই দেখি তাঁর শ্মশান ভূমিতে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজপুরুষদের সঙ্গে জমিদার, ধনী ও সম্ভ্রান্ত অধ্যাপক ও ছাত্রসহ বহু সহস্র সাধারণ মানুষ। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে বরাদ্দ করলেন চার হাজার টাকা। ১৫ মন চন্দন কাঠ, এক মন ঘি আর এক মন ধূপধুনো দিয়ে চিতা সাজানো হল। চিতায় অগ্নিসংযোগ করলেন নিকটাত্মীয় রাধিকাচরণ নন্দী। স্বর্ণময়ীর সোনার দেহ দেখতে দেখতে ভস্মে পরিণত হলো।

এই তিন রানি যেন সেবার মূর্তি– দান-ধ্যানে তিন জনের মধ্যেই আশ্চর্য মিল। কেবল স্বর্ণময়ী দত্তক নিতে রাজি হননি। তিনি যে সমস্ত মানুষকেই দত্তক হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। ❑

চিরকালের পুজো তখন এবং এখন

প্রফুল্ল রায়

আমার ছেলেবেলা এবং কৈশোরের বেশ কয়েকটা বছর কেটেছে পূর্ব বাংলার মস্ত এক গ্রামে, আমার মামা বাড়িতে। এখন যেটা স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ, তখন সেটাই ছিল পূর্ব বাংলা। সেই সময় আশ্বিন মাসে আমাদের গ্রামটার যেদিকেই তাকানো যাক, অজস্র কাশফুল। শিউলি গাছগুলো অবিরল ফুল ফুটিয়ে যেত। শিউলির মৃদু সুগন্ধ শরতের বাতাসে ভেসে বেড়াত। মনে পড়ে, আমাদের অত বড় গ্রামে মাত্র পাঁচটি পুজো হত। চারটে বাড়ির পুজো, একটা বারোয়ারি। গ্রামের মাঝখানে একটা ফাঁকা মাঠে মেরাপ বেঁধে বারোয়ারি পুজোটার আয়োজন করা হত। সব ক'টি প্রতিমাই সাদামাঠা। এক চালিতে দুর্গা, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী, অসুর। প্রতিমাগুলো ডাকের সাজে সাজানো হত।

যে সব বাড়িতে পুজো হত সেগুলো কিন্তু তাদের একান্ত নিজস্ব নয়। যেন সারা গ্রামেরই পুজো। ভোর হতে না হতেই অন্য সব বাড়ির মেয়েরা স্নান করে নতুন শাড়ি পরে পুজো বাড়িগুলোতে চলে যেত। ফুল, দুর্বা, বেলপাতা, আম্রপল্লব জোগাড় করে এনে দিত। কেউ কেউ প্রতিমার সামনের অনেকটা এলাকা ধুয়ে-মুছে তকতকে করে তুলত। কারণ এখানে বসেই পুরোহিত পুজো শুরু করবেন।

মনে আছে নবমীর রাতে বারোয়ারি পুজোর মণ্ডপের পাশে যাত্রার আসর বসত। একবার বিখ্যাত নট্ট কোম্পানি এসে পালা গেয়ে গিয়েছিল। সেই পালা শুনতে চারপাশের আট-দশটা গ্রাম উজাড় করে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ চলে এসেছিল। পুজোর আনন্দ তো ছিলই। সেই সঙ্গে এই বিনোদনটুকু সেই সময় যে কত বড় প্রাপ্তি, বলে বোঝানো যাবে না।

যে বাড়ির পুজো সেই বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কেউ কেউ ফল কাটতে বসে যেত। কেউ পাটায় চন্দন ঘষত। কেউ ফুলের মালা গাঁথত। দুর্গাপুজো যে সার্বজনীন, বহুদূরের সেই গ্রামটিতে বোঝা যেত। তবে বারোয়ারি পুজোর মণ্ডপটায় ভিড় হত অনেক বেশি। ঢাকের বাজনা, মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনির মধ্যে এক সময় পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ, সারি বেঁধে অঞ্জলি দেওয়া, সন্ধেবেলায় আরতি, ধুনুচি নাচ সব মিলিয়ে সমস্ত গ্রামটা আশ্চর্য এক পবিত্রতায় ভরে থাকত।

মনে আছে নবমীর রাতে বারোয়ারি পুজোর মণ্ডপের পাশে যাত্রার আসর বসত। একবার বিখ্যাত নট্ট কোম্পানি এসে পালা গেয়ে গিয়েছিল। সেই পালা শুনতে চারপাশের আট-দশটা গ্রাম উজাড় করে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ চলে এসেছিল। পুজোর আনন্দ তো ছিলই। সেই সঙ্গে এই বিনোদনটুকু সেই সময় যে কত বড় প্রাপ্তি, বলে বোঝানো যাবে না। এর জন্য সারা বছর আমরা অপেক্ষা করে থাকতাম। পরদিন দশমী। দুপুরের মধ্যে সধবা মহিলাদের সিঁদুর খেলা শেষ হয়ে গেলে ঢাক বাজাতে বাজাতে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হত গ্রামের পাশের নদীর ঘাটে।

বিসর্জনের পর ফিরে আসতে আসতে সন্ধে পেরিয়ে যেত। দাদু, দিদা, মা, মাসিমা, মামা-মামিমাদের প্রণাম করে গ্রামের অন্য সব বাড়িতে গিয়ে বড়দের প্রণাম করে মিষ্টি খাওয়া চলত। প্রতিটি বাড়ির মামিমা-মাসিমারা দশমীর দিন সেই সকাল থেকে যত্ন করে কত রকম মিঠাই যে তৈরি করে রাখতেন পাতক্ষীরের পুর দেওয়া পাটিসাপটা, মুগের তক্তি, নারকেল ঝিরিঝিরি করে কেটে চিনির রসে পাক দিয়ে গঙ্গাজলি, ক্ষীরের নাড়ু, চন্দ্রপুলি, চসি। এসব মিষ্টির সঙ্গে কত মায়া যে জড়ানো থাকত। সেই দিনগুলো সোনার ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো আমার স্মৃতিতে থেকে গেছে।

দেশভাগের পর সর্বস্ব খুইয়ে কলকাতায় চলে এলাম। আমরা তখন আকাট রিফিউজি। থাকতাম ভবানীপুর আর কালীঘাটের মাঝামাঝি একটা পাড়ায়। কলকাতায় এসে তাক লেগে গেল। আমাদের গ্রামে ছিল গোনাগুনতি পাঁচটি পুজো। ছোট ছোট প্রতিমা। আর এখানে শ'য়ে শ'য়ে। প্রতিটি রাস্তায় আর পার্কে প্যাণ্ডেল খাটিয়ে পুজোর আয়োজন করা হত। বেশিরভাগই বারোয়ারি পুজো। কিছু বাড়ির পুজোও ছিল। আমাদের গ্রামের মতোই ডাকের সাজে সাজানো এক চালির প্রতিমা। এই প্রতিমাগুলো ছিল বিশাল বিশাল। পোটোপাড়া আর কুমোরটুলির নিপুণ মৃৎশিল্পীরা এইসব মূর্তি গড়তেন। একচালির প্রতিমাই শুধু ছিল না। কোনও কোনও মণ্ডপে কৃত্রিম পাহাড় বানিয়ে দুর্গা, লক্ষ্মী, গণেশদের আলাদা আলাদা স্থাপন করা হত। মণ্ডপের সাজসজ্জা আর অজস্র আলো পূর্ব পাকিস্তান থেকে উৎখাত হয়ে আসা একটি উদ্বাস্তু কিশোরকে মুগ্ধ করে দিত।

বারোয়ারি পুজোগুলো হত এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে। জোরাজুরি ছিল না। যার যেমন সামর্থ্য সে তেমন টাকা দিত। আমরা রিফিউজি, তাই আমাদের জন্য মাত্র এক টাকা চাঁদা ধার্য হয়েছিল। প্রতিটি পাড়ার পুজো কমিটির সভাপতি থাকতেন এলাকার সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়, উচ্চশিক্ষিত কেউ। যেমন অধ্যাপক, আইনজ্ঞ বা অর্থনীতিবিদ, এরকম। পুজোগুলোর উদ্বোধন করতেন সমাজের জ্ঞানী-গুণী বিশিষ্টজনেরা। মনে আছে, এমন এক অনুষ্ঠানে গৌরীনাথ শাস্ত্রী মশায়কে দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে শুনেছিলাম। অন্য একটি পুজোর উদ্বোধন করেছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। দেশের মুক্তির জন্য আন্দামানে দশ বছর জেল খেটেছেন। সুপণ্ডিত, নমস্য এই মানুষটির মুখ এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাঁর নামটি ভুলে গেছি।

গ্রামে যেমন দেখেছি, এখানেও তেমনি নিষ্ঠাভরে পুজো করা হত। আচার-অনুষ্ঠানে বিন্দুমাত্র ত্রুটি থাকত না। মনে আছে অষ্টমীর দিন দুপুরে লাইন দিয়ে পাড়ার সবাইকে ভোগ খাওয়ানো হত। যাঁরা বৃদ্ধ বা অসুস্থ তাঁদের বাড়িতে পুজোর উদ্যোক্তারা ফলপ্রসাদ আর ভোগ দিয়ে আসত। গ্রামে যেমন দেখেছি, কলকাতার পাড়াগুলো প্রায় তেমনই। প্রতিটি পাড়া যেন এক-একটি বৃহৎ পরিবার। দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, ভাইফোঁটার পর থেকে পাড়ায় পাড়ায় শুরু হত জলসা। সেই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলত গানের আসর। এইসব আসরে গান গাইতেন হেমন্ত, সন্ধ্যা, প্রতিমা, সতীনাথ, উৎপলা, জগন্ময়, ধনঞ্জয়, শচীনদেবদের মতো লিজেণ্ডরা। ভানু, জহরের মতো কৌতুক শিল্পীরা আসর মাতিয়ে তুলতেন।

গত শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশক তো বটেই, সত্তরের দশকের মাঝামাঝি অবধি এমনটাই দেখেছি। তারপর দ্রুত পুজোর ধরন-ধারণ, চেহারা বদলে যেতে লাগল। জলুস, জাঁক-জমক, মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা ক্রমশ বেড়ে চলল। আগে মণ্ডপগুলো ছিল সাদামাঠা। পরে প্রাচীন কোনও সৌধ, উত্তর ভারতের কোনও রাজপ্রাসাদ বা দক্ষিণ ভারতের কোনও বিখ্যাত মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি হতে লাগল। চন্দননগরের ইলেকট্রিশিয়ানরা এসে আলোর জাদুতে মণ্ডপ ভরিয়ে তোলেন। ফলে বাজেট তো বাড়বেই। বাজেট বাড়া মানে চাঁদার জুলুম। দাবি অনুযায়ী চাঁদা না দিলে অনেক জায়গায় দুর্গতির শেষ থাকে না।

এদিকে ছোট-বড়-মাঝারি দেশি কোম্পানি তো বটেই, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর নজর এসে পড়ল পুজোর দিকে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঠাকুর দেখতে বেরন। প্রচারের এমন সুযোগ তো কমই পাওয়া যায়। কোম্পানিগুলো নানা পাড়ার পুজো স্পনসর করতে লাগল। তাদের প্রোডাক্টর বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে পুজোর 'মুখ ঢেকে যায়'। তা ছাড়া সেরা পুজো, সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপসজ্জা বা আলোকসজ্জার জন্য অজস্র আর্থিক পুরস্কার, ট্রফি ইত্যাদি। সেরার তকমাটি দখলের জন্য একপাড়ার পুজোর সঙ্গে অন্য পাড়ার পুজোর এখন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। কয়েক বছর হল, 'থিম' পুজো চালু হয়েছে। কোনও একটি বিষয়বস্তু নিয়ে মণ্ডপ সাজানো হচ্ছে। এসব দেশ-কাল-সমাজ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার প্রয়াস। খুবই সুলক্ষণ।

আগে পোটোপাড়া আর কুমারটুলির মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা গড়তেন। পরে অনেক মণ্ডপে অন্য ধারার বিখ্যাত শিল্পী এবং ভাস্করদের তৈরি মূর্তিও দেখা গেছে। চিরকালীন মাতৃমূর্তি নয়, এই সব শিল্পী দুর্গাকে যেভাবে কল্পনা করেছেন তাঁদের সৃষ্টিতে তেমনটাই ফুটে উঠেছে। আগে মূর্তি গড়ার উপকরণ ছিল শুধুই মাটি, খড়, বাঁশ ইত্যাদি। পরে বেশ কয়েকজন ভিন্ন ধারার শিল্পী কাঠ, পাথর, তামা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি উপাদানে প্রতিমা সৃষ্টি করেছেন।

চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেও দেখেছি, পাড়ার পুজো কমিটিগুলোর মাথায় থাকতেন এলাকার বিশিষ্টজনেরা। এখন সেখানে বেশিরভাগই রাজনীতির লোকজন। আগে পুজো উদ্বোধন করতেন বিখ্যাত সব পণ্ডিত মানুষ। এখন সেখানে চলচ্চিত্র শিল্পীরা।

মোদ্দা ব্যাপার থিম, কর্পোরেট হাউস, রাজনীতি এবং গ্ল্যামারের মিশ্রণে এখনকার পুজো। সময় অনেক কিছুই বদলে দেয়। পুজোর ধরনও সেই নিয়মে বদলে গেছে। এই প্রজন্ম নিশ্চয়ই এই পরিবর্তন চায়। পঞ্চাশ ষাট বছর আগের পুজো যাঁরা দেখেছেন তাঁরাও এসব মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সেকালের সেই পুজোর কথা মনে পড়লে তাঁদের কি একটু-আধটু দীর্ঘশ্বাস পড়ে না? ❑

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥
[অ : ৮, শ্লোক : ১৬]

অনুবাদ ঃ হে অর্জুন, পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মভুবন) পর্যন্ত সপ্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে লাভ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না।
[অ : ৮, শ্লোক : ১৬]

নৈতিকতা–ধর্মে ও সাহিত্যে

ড. সুজিত দত্ত

মানুষের যাবতীয় ধারণার ধারক ও বাহক তাঁর মন। মনই ভাবনার জন্ম দেয়, এবং মনই সেই ভাবনাকে কাজে পরিণত করার প্রণোদনা জোগায়। এই মনোভুবনের দুটো ভাগ– এক ভাগে সত্য ও সুন্দরের প্রকাশ; এটা আলোকিত। এখানে "সুজনে সুযশ গায় কুরব নাশিয়া।" এর নীতি-নির্ধারক যুধিষ্ঠির, বিদুর আর বিভীষণ যাঁদের প্রার্থনা– "সর্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ"; যাঁদের লক্ষ্য ভালোবাসার 'বৃন্দাবন' প্রতিষ্ঠা করা। মনোভুবনের অন্যভাগে আছে অন্যায় ও অসুন্দরের প্রাধান্য; এটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। এখানে "কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া"। এই অংশের নিয়ন্তা দুর্যোধন, শকুনি, আর কালনেমি। এঁরা স্বার্থমগ্ন; এঁদের লক্ষ্য অন্যায়ের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। তাঁদের মনোভাব 'যুদ্ধংদেহি', তাই তাঁদের দৃষ্টি কুরুক্ষেত্রের দিকে। উর্ণনাভের মত তাঁরা আপন স্বার্থের জালে আবদ্ধ এবং "বিমুখ বৃহৎ সংসার হতে"। মনোভুবনের এই দুই অংশের মধ্যিখানে কোন কাঁটাতারের বেড়া নেই; তাই মন চাইলে অনায়াসে ভুবনান্তরে পাড়ি জমাতে পারে। দেখা যায় স্বার্থান্ধ ধৃতরাষ্ট্ররা তাঁদের ক্ষণস্থায়ী বিবেকের তাড়নায় মাঝে মাঝে স্বভুবন ত্যাগ করে আলোকিত বৃন্দাবনী পরিবেশে বিচরণ করতে অভিলাষী হয়, যদিও প্রতিকূল পরিবেশে সে অভিলাষ অপরিণত পুষ্পকলির মতো ফোটার আগেই বৃন্তচ্যুত হয়।

> এবার আরো বড় ষড়যন্ত্র। জতুগৃহে আগুন দেওয়া হলো। আগুনের লেলিহান শিখা প্রচণ্ড উত্তাপ ছড়ালো। কৌরবদের উল্লাস; তাঁদের ধারণা জতুগৃহে অবস্থানরত পাণ্ডবেরা সবাই ভস্মীভূত। কিন্তু না, এ যাত্রায়ও পাণ্ডবেরা বেঁচে গেলেন। বিদুরের কাছে আগাম খবর পেয়ে যথাসময়ে তাঁরা জতুগৃহ ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন।

যুধিষ্ঠির, বিদুর আর বিভীষরণেরা যতই চান "Let there be light, more light," কিংবা "অসতো মাং সদ্গময়", দুর্যোধন, শকুনি এবং কালনেমিরা ততই আলোটা নিভিয়ে অন্ধকারকে আবাহন করে। তাঁদের কূটকৌশল সুনীতির অন্তরায়। তা অন্যদের বিভ্রান্ত করে, পথভ্রষ্ট করে; ফলে অন্যায় ও অসত্যের প্রাবল্যে সত্য ও সুন্দর চাপা পড়ে যায় যেমন করে ঘন মেঘের আড়ালে চাঁদের আলো ঢাকা পড়ে যায়। বিবেক বিলুপ্ত হয়, সুনীতি তখন নির্বাসনে যায়, "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।" এমতাবস্থায় "সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে, ঘোচাবে কে?" ফলে সমাজে অরাজকতা নেমে আসে।

ফসলের ক্ষেতে আগাছা জন্মায়; তারা ফলন ব্যাহত করে। দুর্যোধন, শকুনি আর কালনেমিরা 'সমাজ-উদ্যানের' আগাছা। সর্বকালের সর্বসমাজে তাঁরা ছিলেন; এখনো আছেন। তাঁদের উপস্থিতিতে সমাজ হয়ে ওঠে একটি unweeded garden; তাই আমরা সাবধানবাণী শুনতে পাই "ত্যজ দুর্জন সংসর্গম্, ভজ সাধু সমাজমম্।" অতএব সাধু সাবধান।

দুর্যোধন, শকুনি আর কালনেমিরা সুযোগসন্ধানী। আমাদের কাছে তাঁরা বিভিন্ন নামে পরিচিত। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তাঁরা দুষ্কৃতিকারী। ভগবান বলেছেন, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতিকারীদের নিধনের জন্য (পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্") তিনি বার বার অবতীর্ণ হবেন। সামাজিক দিক থেকে তাঁরা কুচক্রী, স্বার্থান্বেষী; আর সাহিত্যের পরিভাষায় তাঁরা খলনায়ক বা Villain; তাঁরা অর্থগৃধ্নু, ক্ষমতালিপ্সু। তাঁদের কূটচাল শান্তির পক্ষে অন্তরায়। কখনো তাঁরা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করেন; আবার কখনো নিজেদের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ে করুণ পরিণতির স্বীকার হন। সমাজে তখন স্বস্তি নেমে আসে।

মনে পড়ে গেল "কালনেমির লঙ্কা ভাগের' কথা। রাম-রাবণের যুদ্ধে শক্তিশেলে আক্রান্ত লক্ষ্মণ মৃতপ্রায়। প্রাণরক্ষার ঔষধি বিশল্যকরণী আছে গন্ধমাদন পর্বতে। লক্ষ্মণকে বাঁচাতে হনুমান সেই ঔষধি আনতে গেলেন গন্ধমাদনে। রাবণ ভাবলেন, লক্ষ্মণ বেঁচে গেলে বিপদ ভয়াবহ হতে পারে। তাই যে করেই হোক হনুমানকে মারতে হবে। কিন্তু উপায়? মামা কালনেমির পরামর্শ চাইলেন রাবণ। দুরভিসন্ধিতে সিদ্ধহস্ত কালনেমি নিজেই হনুমানকে হত্যা করতে রাজি হলেন। বিনিময়ে চাই পুরস্কার– অর্ধেক লঙ্কাপুরীর রাজত্ব। রাবণ সম্মত। কালনেমি ধুরন্ধর বাস্তববাদী। হনুমানকে হত্যার পূর্বেই তিনি পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন লঙ্কাপুরীর কোন অংশ তাঁর চাই। এ যেন গাছে না ওঠতেই এক কাঁদি। কিন্তু বিধি বাম। দুর্ভাগ্য কালনেমির; তাঁর অর্ধরাজ্যের অধীশ্বর হওয়ার আশায় গুড়ে বালি। কালনেমির অভিপ্রায় জানতে পেরে হনুমান তাঁর অতিথি হওয়ার অনুরোধ ফিরিয়ে দিলেন। ক্রোধে কালনেমিকে দু'হাতে ধরে সজোরে ছুঁড়ে মারলেন আকাশে। কালনেমির মৃতদেহ এসে পড়ে সোজা রাবণের সিংহাসনে। দুর্ভাগ্য রাবণের; হনুমানকে হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল। মনে মনে তিনি প্রমাদ গুণলেন। নিজের এবং লঙ্কাপুরীর ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন রাবণ।

শাস্ত্রগ্রন্থ, ধর্মীয় কাহিনী দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের কথা বলে। আমাদের নৈতিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যায় ও অসুন্দরকে বর্জন করে ন্যায় ও সত্যের পথে চলতে শেখায়। ধর্মীয় কাহিনীর মতো সাহিত্যেরও মূল প্রতিপাদ্য নৈতিকতা বা divine justice। কালজয়ী সাহিত্যকর্ম চরিত্র-চিত্রণ ও ঘটনা-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে নৈতিকতার আদর্শকে পাঠকের সামনে তুলে ধরে।

গল্পের 'ক্যানভাস'-এ নায়ক (Protagonist) ও প্রতিনায়ক (antagonist) এর সংঘাত, পরস্পরবিরোধী কর্মকাণ্ড, আদর্শগত ভিন্নতা এবং তার পরিণতি পাঠকের মনে ভাবান্তর ঘটায়। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুন্দর-অসুন্দর, করণীয়-বর্জনীয় প্রভৃতি সম্বন্ধে পাঠককে ভালো করে বুঝতে শেখায়। ফলে সাহিত্য পাঠ ও অনুধাবন পাঠককে আরো মানবিক, আরো নীতিবান এবং তাঁর রুচিকে আরো পরিশীলিত করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় দু'জন খলনায়কের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা। এঁদের একজন ধর্মগ্রন্থ মহাভারতের অন্যতম চরিত্র দুর্যোধন, অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র; অন্যজন William Shakespeare-এর নাটক Hamlet-এর খলনায়ক Claudius (ক্লডিয়াস), ডেনমার্ক-এর রাজা হ্যামলেট-এর ছোটভাই। দুর্যোধন ও ক্লডিয়াস-এর সময় আলাদা, সমাজ আলাদা; কিন্তু কি অপূর্ব মিল তাঁদের মনোবৃত্তিতে। তাঁরা উভয়েই মানুষের অপরিশীলিত সহজাত প্রবৃত্তির ধারক, কালভেদে এবং স্থানভেদে যার কোন রূপান্তর ঘটে না। তাই পৃথিবীর সর্বত্র সবসময় "evil people think alike"।

প্রথমেই দুর্যোধন প্রসঙ্গ। রাজা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্র নজরদার (caretaker) রাজা। সেই সুবাদে যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন উভয়েই যুবরাজ। যুধিষ্ঠির বয়সে বড় এবং লোকপ্রিয়। তাই রাজা হওয়ার সম্ভাবনা তাঁরই বেশি। কিন্তু দুর্যোধন তা মানবেন কেন? তাঁর যুক্তি পরিষ্কার– অন্ধত্বের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে রাজা করা হয়নি। এবার বয়সের অছিলায় দুর্যোধনকে রাজা করা হবে না– তা কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না। এখানে বলে রাখা ভালো এই সেই দুর্যোধন যাঁর জন্মলগ্নে শেয়াল, শকুন ও কাকের অশুভ ডাক শোনা গিয়েছিল– 'তং খরাঃ প্রত্যভাষন্ত গৃধ্র-গোমায়ু-বায়সাঃ"। কোষ্ঠি গণনায় দেখা গেল এই জাতক একদিন সমগ্র কুরুবংশের ধ্বংসের কারণ হবে। পণ্ডিত বিদুর কুলরক্ষার্থে দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তা মানতে পারেননি। তিনি শুধু জন্মান্ধ নন, পিতৃস্নেহেও অন্ধ।

স্বীয় সিদ্ধান্তে অবিচল দুর্যোধন। যে করেই হোক সিংহাসন তাঁর চাই। অতএব একের পর এক ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতা হলো। প্রথম ষড়যন্ত্র ভীমের বিরুদ্ধে। বুদ্ধিটা কিছু কম হলেও শরীরের দিক থেকে তিনি মস্ত পালোয়ান এবং গদাযুদ্ধে তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁকে মাইনাস করতে পারলে পাণ্ডবেরা দুর্বল হয়ে পড়বেন। ভীম ভোজন রসিক; তাই খাবারের সাথে গোপনে বিষ মিশিয়ে তাঁকে মারার পরিকল্পনা হলো। বিষক্রিয়ায় ভীম অচেতন হয়ে পড়লে কৌরবেরা তাঁর হাত-পাত বেঁধে গঙ্গায় ছুড়ে ফেললেন। আটদিন ধরে কোন হদিস নেই; পুরবাসী সব উদ্বিগ্ন। কৌরবেরা নিশ্চিত যে ভীম মারা গেছেন। বাসুকীর পরিচর্যায় সুস্থ হয়ে ভীম যখন ফিরে এলেন দুর্যোধনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো।

প্রশ্ন উঠতে পারে বিনাদোষে ভ্রাতৃহত্যা প্রচেষ্টা– তা'কি মানা যায়? –যায় না। তবে দুর্যোধনের মতো "ম্যাকিয়াভেলিয়ান" চরিত্রের লোকেরা বিশ্বাস করেন– Ends justify the means বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য যেকোন অন্যায় কাজও জায়েজ। সুতরাং দুর্যোধনের কাছে ভ্রাতৃহত্যা কোন অন্যায় কাজ হতে পারে না। তা না হয় মানলাম; কিন্তু সে কাজে ধৃতরাষ্ট্রের নীরব সমর্থন– তা'ও কি মানা যায়?

এবার আরো বড় ষড়যন্ত্র। জতুগৃহে আগুন দেওয়া হলো। আগুনের লেলিহান শিখা প্রচণ্ড উত্তাপ ছড়ালো। কৌরবদের উল্লাস; তাঁদের ধারণা জতুগৃহে অবস্থানরত পাণ্ডবেরা সবাই ভস্মীভূত। কিন্তু না, এ যাত্রায়ও পাণ্ডবেরা বেঁচে গেলেন। বিদুরের কাছে আগাম খবর পেয়ে যথাসময়ে তাঁরা জতুগৃহ ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। কই ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ প্রভৃতি তুখোড় নীতিবাগীশরা তো এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেদিন কোন প্রতিবাদ জানান নি? তখন একমাত্র বিদুর, যিনি ছিলেন "পাণ্ডবানাং হিতে যুক্তঃ", বিবেকের কণ্ঠস্বর হিসেবে কড়া আপত্তি জানিয়েছিলেন।

কিছুদিন পরের ঘটনা। পাণ্ডবেরা তখন ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিষ্ঠিত। ঈর্ষান্বিত কৌরবেরা আবারো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এবারের পরিকল্পনা– পাণ্ডবদের হৃতরাজ্য করতে হবে। শলা-পরামর্শ করার জন্যে ডাক পড়লো শকুনির। শকুনি কূটচালে নিপুণ, খাসা জুয়াড়ি। বললেন, যুদ্ধে নয়, পাশাখেলায় পাণ্ডবদের জয় করে নেবেন। মুরুব্বীদের নিষেধে কান দিলেন না দুর্যোধন। প্রশ্ন উঠতেই পারে সর্বনাশা পাশাখেলায় যুধিষ্ঠির কেন সম্মতি দিলেন? কথায় বলে "বিপত্তিকালে ধীয়োঽপি পুংসাং মলিনোঽধিগচ্ছতি" বা বিপত্তিকালে বিচক্ষণ ব্যক্তির বুদ্ধিও লোপ পায়। শুনেছি চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। যুধিষ্ঠির চরিত্রের দুর্বলতা তাঁর পাশাখেলার নেশা। একে একে সব হারালেন যুধিষ্ঠির। শেষে বাজি রেখে দ্রৌপদীকেও হারালেন। অতঃপর দুঃশাসন চুলের মুঠি ধরে কুলবধূ দ্রৌপদীকে নিয়ে এলেন সভাকক্ষে; আর দুর্যোধন তাঁর নগ্ন উরুতে দ্রৌপদীকে বসতে আহ্বান জানালেন। এখানে একটাই প্রশ্ন– দুর্যোধন-দুঃশাসনের ভ্রাতা, পিতা, পিতামহ এবং অমাত্যবর্গরা এ দৃশ্য দেখে কিভাবে স্থির থাকতে পেরেছিলেন?

পাশাখেলায় সর্বস্বান্ত পাণ্ডবেরা এখন বনবাসে। বনবাস ফেরত তাঁরা নিজেদের থাকার জন্যে পাঁচখানি গ্রাম চাইলে দুর্যোধনের সাফ জবাব, "বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচ্যগ্র মেদিনী।" কৌরবের নীতি নির্ধারকরা কোন রকম কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। পাণ্ডবদের জন্য এ যুদ্ধ ছিল নিজেদের অধিকার আদায়ের যুদ্ধ; অন্যদিকে কৌরবদের কাছে তা ছিল অন্যায়ভাবে অপরের অধিকার হরণ করার যুদ্ধ। আঠারো দিনের যুদ্ধ শেষে কৌরববাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্যোধনের জন্মমুহূর্তে পণ্ডিতদের দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হলো।

এবার আসি Shakespeare-এর খলনায়ক ক্লডিয়াসের কথায়। দুর্যোধনের মত ক্লডিয়াসও দুরাচারী এবং ক্ষমতালিপ্সু। বড় ভাই হ্যামলেট এখন রাজা। রাজপুত্র হ্যামলেট পরবর্তীতে রাজা হবেন প্রচলিত নিয়মানুসারে। অতএব ক্লডিয়াস-এর রাজা হওয়ার স্বপ্ন

বাতুলতা মাত্র। তিনি ভালোই জানেন রাজা হ্যামলেট জনপ্রিয়; তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে কোন সাড়া মিলবে না। রাজা হতে হলে ক্লডিয়াসকে পেছন দুয়ার দিয়ে আসতে হবে। যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। গোপনে কানে বিষ ঢেলে রাজাকে হত্যা করলেন। আর প্রচার করলেন বাগানে বিশ্রামরত অবস্থায় সাপের কামড়ে রাজার মৃত্যু হয়েছে। তা না হয় বিশ্বাস করা গেল, কিন্তু সামাজিক রীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে মৃত্যুর এক মাসের মধ্যেই বড় ভাই-এর বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করলেন যেদিন সেদিন কি কোন প্রতিবাদ উঠেছিল? উপরন্তু রাজার মৃত্যুর পর রাজা হওয়ার কথা রাজপুত্র হ্যামলেট-এর। কিন্তু ক্লডিয়াস যেদিন গায়ের জোরে নিজেই রাজা হয়ে গেলেন, সেদিন সবাই চুপ ছিলেন। রাজপুত্র হ্যামলেট-এর মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে– বাবার মৃত্যুর সাথে কাকা ক্লডিয়াস কি কোনভাবে জড়িত? মধ্যরাতে বাবার প্রেতাত্মা এসে যখন যুবরাজ হ্যামলেটকে বললো ক্লডিয়াসই তাকে কানে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে, এখন থেকেই হ্যামলেট পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। হ্যামলেট আনমনা, বিষণ্ন। তাঁর অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করে ক্লডিয়াসও দুর্যোধনের মতো ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতলেন। হ্যামলেটকে মারতে হবে; তবে ডেনমার্কে নয়, ভিন দেশে, ইংল্যাণ্ডে, কারণ গার্ট্রুড-এর মাতৃহৃদয় তা কখনো মেনে নেবে না। দুই বন্ধুর সাথে হ্যামলেটকে ইংল্যাণ্ডের জাহাজে তুলে দেওয়া হলো। সাথে রাজার একটি গোপন চিঠি যাতে লেখা ছিল "Kill Hamlet on arrival"। ক্লডিয়াস-এর কপাল মন্দ। জাহাজ পড়লো দস্যুর কবলে। মুক্তিপণের দাবিতে হ্যামলেটকে তুলে নিল ডাকাতরা। হ্যামলেট ডেনমার্ক-এ ফিরে এলে ক্লডিয়াস প্রমাদ গুণলেন।

আবারো ষড়যন্ত্র হ্যামলেট-এর বিরুদ্ধে। এবার ক্লডিয়াস একা নন সাথে মন্ত্রীপুত্র 'ল্যায়ার্টিজ'। দুর্যোধন এবং শকুনি যেভাবে যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় আহ্বান জানিয়েছিলেন ক্লডিয়াস এবং ল্যায়ার্টিজ হ্যামলেটকে অসিযুদ্ধে (Swordfight) আহ্বান জানালেন। সেই সাথে বাড়তি সতর্কতা– ল্যায়ার্টিজ-এর তরবারিতে বিষ মাখানো হলো। 'প্ল্যান বি'-তে গ্লাসে পানীয়ের সাথে বিষ মিশানো হলো যাতে 'প্ল্যান-এ' ব্যর্থ হলে 'প্ল্যান-বি' কাজ করে। তাই হলো। প্রথম দিকের রাউণ্ডে হ্যামলেট জয়ী হলেন। কপট খুশীতে ক্লডিয়াস হ্যামলেট-এর সামনে তুলে ধরলেন বিষ মাখানো পানীয়ের গ্লাসটি। "এখন চাই না" বলে হ্যামলেট তা ফিরিয়ে দিলেন। পরবর্তী রাউণ্ডেও হ্যামলেট বিজয়ী। মায়ের হৃদয় বলে কথা। ছেলের বিজয়ের আনন্দে মা গার্ট্রুড পানীয়ের গ্লাসটি হাতে নিয়ে চুমুকেই নিঃশেষ করলেন। তিনি জানতেন না গ্লাসে বিষ মেশানো ছিলো। পরবর্তী রাউন্ডে এক অসতর্ক মুহূর্তে দু'জনার তরবারি বদল হয়ে গেলো। ল্যায়ার্টিজ-এর বিষ মাখানো তরবারি গেলো হ্যামলেট-এর হাতে আর হ্যামলেট-এর তরবারি গেল ল্যায়ার্টিজ-এর হাতে। হ্যামলেট আঘাত করলেন ল্যায়ার্টিজকে, ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ল ক্ষতস্থানে। খেলার নিয়ম ভেঙ্গে ল্যায়ার্টিজও আঘাত করলেন হ্যামলেট-এর পিঠে। মৃত্যুর কাছাকাছি ল্যায়ার্টিজ। হঠাৎ তাঁর ভাবান্তর হলো– ক্লডিয়াসের সব ষড়যন্ত্র তিনি হ্যামলেটের কাছে ফাঁস করে দিলেন। ইতোমধ্যে বিষক্রিয়ায় রাণী গার্ট্রুড মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। কুচক্রী ক্লডিয়াসকে হত্যা করে হ্যামলেট পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিলেন। বিষক্রিয়ায় ঢলে পড়লেন ল্যায়ার্টিজ। বেঁচে থাকলেন না হ্যামলেটও। ড্যানিশ রাজবংশের সবাই এখন নিশ্চিহ্ন যেমন নিশ্চিহ্ন হয়েছিলেন কুরুবংশ। ডেনমার্ক-এর সিংহাসন চলে গেলো নরওয়ের অধীনে।

উপরের পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় দুর্যোধন ও ক্লডিয়াস উভয়েই খলনায়ক; তাঁরা একই উপাদানে তৈরি। উভয়েই রাজ্যলোলুপ, ধর্মজ্ঞানহীন, দুর্মুখ এবং দুরাত্মা, তাঁরা ষড়যন্ত্রে নিপুণ, স্বার্থসিদ্ধিতে অবিচল এবং আচরণে অমার্জিত, তাঁরা আঁধারের যাত্রী। দুর্যোধন যদি বিদুরের কথামত পাণ্ডবদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে রাজি হতেন তাহলে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ সংঘটিত হতো না এবং অনুরূপভাবে ক্লডিয়াস যদি দেশের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী রাজপুত্র হ্যামলেটকে রাজা হওয়ার সুযোগ দিতেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা থেকে বিরত থাকতেন তাহলে ডেনিশ রাজপরিবারও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো না। দুর্যোধন ও ক্লডিয়াস-এর কাজ সদাচার এবং সুনীতি বিবর্জিত, তাই তা আমাদের হৃদয়ে বিষাদের সৃষ্টি করে যেমনটি করেছিলো কৌরবদের কর্মকাণ্ড অর্জুনের হৃদয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে। তাই শান্তির উদ্দেশ্যে আমাদের প্রার্থনা হোক–

"Let there be light!"
"Let there be peace." ❑

Hindu Mathematics and Astronomy

Prasad Banerjee

Aryabhatta, a prominent Mathematician and Astronomer of his time, was born and lived in Pataliputra (modern-day Patna) from 476 to 550 A. D. He had written a book on mathematics and astronomy of his day, titled Aryabhattiya. Amongst other things he stated that earth rotates around its axis, and not the heavens. He recorded the minute variations in the motion of the Moon around the Earth with extraordinary accuracy. He noted that the earth is round in shape and went on to calculate its circumference. It was Aryabhatta's suggestion that the Date should be changed at midnight instead of at sunrise. The motion of the earth around the Sun with it's axis tilted at an angle to the plane of the elliptic and the rotation of this axis was known to the ancient Indian Astronomers. The period of rotation (Ayanamsa) has been given as 25,000 years which modern astronomy calculates as 24,800 years. He is also credited with introducing the concept of positional value in expressing a number in the decimal system. This simplified the process of Addition and Multiplication considerably. Albert Einsteinis quoted as saying **"We owe a lot to the Indians, who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made". - Albert Einstein.**

The Moon gets its shine from the Sun's light was clearly known to the Risish's of Rig Veda. So was their knowledge of the difference of Solar and Lunar years and the corresponding adjustment by counting an extra month in Lunar calendar, every three years.

The Moon gets its shine from the Sun's light was clearly known to the Risish's of Rig Veda. So was their knowledge of the difference of Solar and Lunar years and the corresponding adjustment by counting an extra month in Lunar calendar, every three years. R.V. 1.84.15,1.25.8

Bhakaracharya, a 12th century Astronomer stated in his Treatise on Astronomy – Siddhant Shiromani – that the heavenly bodies attract each other, by virtue of which they are going round and round in their own respective paths in the heavens. He went on to say that our Earth also attracts everything towards its centre and that is why we are stuck on its surface. As proof he states that an arrow shot up returns back to earth and a fruit when ripe falls to the ground. This was stated some 400 years before Sir Isaac Newton discovered Gravitation.

Bhaskaracharya is also credited with developing Trigonometry and Mensuration, estimating the value of "Pai", in determining the area and circumference of a circle and solving some Algebraic Equations. In his famous book "Lilavati" he gives many interesting problems and solutions. Another ingenious method, using principle of approximation and limits was used for determining the value of "Pai" (area of a circle) by some South Indian (Kerala) mathematician of the Mahava School Another great Mathematician was the fourth century, Shreedhar Acharya, who solved the Quadratic Equation in Algebra (Veej Ganit) by the method of completing the square and expressing the equation as difference of two squares, thereby indicating two roots (+ ve and – ve). The contribution of Indians in Mathematics, Science and Astronomy are many and the students are encouraged to research on the subject through Internet, where some interesting information are available. Compiled by: Prasad Banerjee. ❑

কবিতাঙ্গন

ছদ্মবেশী

ঋতুশ্রী ঘোষ

তুমুল বৃষ্টি।
তু... মু... ল বৃষ্টি।

আমার শোবার ঘরে জানালার কাচে জড়াজড়ি করে,
গড়াগড়ি খায়, হুড়োহুড়ি করে, কেঁদে ভাসায়।

তুমুল বৃষ্টি, দারুণ সখ্যতা।
একে অপরের মিশে থাকা, মিলে থাকা, লেপ্টে থাকা...

তু... মু... ল বৃষ্টি।
শুধু আমার বৃষ্টি
একাকী ঝরে পড়ে
ভিন্ন কপোল বেয়ে
একাকী নিঃসঙ্গ বৃষ্টি।
একাকী ভেজা কাক,
একাকী আমার বৃষ্টি,
একাকী তুমুল বৃষ্টি।

অমোঘ কাঙ্ক্ষিত শরীরে লেপ্টে থাকা বৃষ্টি,
টিনের ছাদে ছন্দের জাদুকর বৃষ্টি,
মাছেদের আর ব্যাঙেদের দস্যিপনার বৃষ্টি,
বেদনা ভেজা ব্যথাতুর বৃষ্টি,
গৃহহীন বালিকার অসহায় লজ্জাতুর বৃষ্টি।
তুমুল বৃষ্টি ...।

তু... মু... ল বৃষ্টি।
আমার পড়ার ঘরে জানালার কাচে
লেপ্টে লেপ্টে ধুয়ে যাওয়া
অশাব্দিক বৃষ্টি।
তোর নাম দিলাম ছদ্মবেশী।

শুভ্র জীবন

পূরবী পাল

খোকা-খুকুর প্রাণের হাসি মনে আনে সুখ
আকাশ ভরা ভুবন, তাতে নেইকো কোন দুখ ॥
জটপাকানো দ্বিধাদ্বন্দ্বের দেখি না কোন লেশ
মুখ ভরানো হাসি অবাক চোখে নেই কোন বিদ্বেষ ॥
কচি কোমল প্রাণগুলি শান্তির মহাদূত
হাসি-গানে ভরিয়ে তোলে দেখা যায় না কোন খুঁত ॥
সোজা সরল জীবন তাদের নেইকো চাওয়ার লোভ
উচ্ছ্বসিত আনন্দই ভরা কোনোখানে নেই ক্ষোভ ॥
মনে ভাবি পৃথিবীটা হয় না কেন এমন?
ডেকে আনি কেনো যুদ্ধ বিবাদ দ্বন্দ্বে করি আত্মমগন?
তরুণ তাজা প্রাণগুলি আনন্দে ভরপুর
যেন বীণার তারের ঝংকারে বাজে নতুন নতুন সুর ॥
ভবিষ্যতের কিশলয় উঠুক গড়ে নতুন করে
এই কামনাই করি প্রভু তোমায় শত প্রণাম ভক্তি ভরে ॥

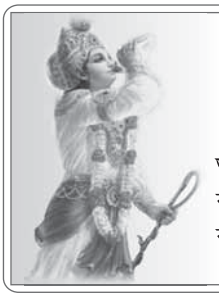

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥

[অ : ১২, শ্লোক : ১০]

অনুবাদ ঃ যদি তুমি এই প্রকার অভ্যাস করিতে সমর্থ না হও, তবে ভগবৎপ্রীতিকর কর্মে একনিষ্ঠ হও। কারণ আমার কর্ম করিতে করিতেই তুমি ক্রমে সিদ্ধিলাভ করিবে।

[অ : ১২, শ্লোক : ১০]

মানুষের মূল্য

শিব চক্রবর্ত্তী

এই শুধু বলিবারে চাই–
সকলের মূল্য আছে, মানুষের মূল্য কিছু নাই।
আমি আজ বলিবারে চাই,
শূন্যসম মূল্যহীন এরা– মানুষের আর দাম নাই।
তাই তার এত হেলাফেলা
মানুষ-জীবন নিয়ে চিরদিন ছিনিমিনি খেলা!
জীর্ণপত্রে পুঁথির বিধান–
তারো মূল্য আছে, আছে তাহারো সম্মান!
কীট-দষ্ট দলিল পুঁথির আছে দম্ভ, আছে অধিকার,
কোটি কোটি মানুষের জীবনে ব্যর্থতা রচিবার!
যুগজীর্ণ কঙ্কালের নির্দেশের ফেরে
মানুষের প্রেম রুদ্ধ, প্রাণ রুদ্ধ, গতি রুদ্ধ–
মানুষ না ছোঁয় মানুষেরে!
সনাতন শাস্ত্রের আদেশ–
আলোকের আনন্দের দেশে রমণীর চির-অপ্রবেশ!
ভুবনের রূপে রসে প্রেমে যৌবনে স্বাতন্ত্র্যে নাই দাবি,
জীবনে কেবল তার এক কারাগার হ'তে
অন্য কারাঘরে পড়ে চাবি!
সেই জীর্ণ পত্র মাঝে জীর্ণতর ছত্র নিয়ে চলে খুনোখুনি;
মানুষের জীবনের নব নব কুরুক্ষেত্র
রচে নিত্য নব কৃষ্ণ নূতন ফাল্গুনী
মানুষের জেদের নিকটে মানুষের জীবনের দাম
লেখে নিত্য অস্ত্রমুখে নব নব ডায়ার ও শ্রীপরশুরাম!
নির্বিচারে শিশুবৃদ্ধ করিয়া সংহার
দেশে দেশে পূজ্য হয় তারা, খ্যাত হয় নব অবতার!
রাষ্ট্র-ধর্ম-শাস্ত্র-গুরু-মন্ত্র-তন্ত্রে দিয়া সিংহাসন
ষড়-যন্ত্রে চলিতেছে মানুষের শোষণ-শাসন!
আমি আজ চাহি তার নাম–
কোন্ যুগে মানুষের জীবনের কেবা দিল দাম?
কে বলিল উচ্চকণ্ঠে ডাকি,
জীবন কেবল সত্য, শাস্ত্র রাষ্ট্র সব-কিছু ফাঁকি?
জীবন ভরিতে হবে আলোকে পুলকে প্রেমে প্রাণে
জীবন-বিরুদ্ধ যাহা মিথ্যা তাহা, নাই তার মানে;
শত শত শাস্ত্র চেয়ে একটি জীবন মূল্যবান–
রাষ্ট্র লাগি নয় কেহ, মানুষের লাগি তার স্থান।
সৌন্দর্যেরে, সম্পদেরে রমণীরে করি' অবরোধ
জীবন জীবন নহে– শুধু প্রকৃতির প্রতিশোধ!
কোন বুদ্ধ কহিল, শুধাই?–
রিক্ত করি' ব্যর্থ করি' নহে– পূর্ণ করি' জীবনেরে চাই?
যুগে যুগে নব নব ধর্ম-অধিকারী
মানুষেরে করিল কসাই– কিম্বা তারে করিল ভিখারী!
ক্ষুদ্র শিল নোড়ানুড়ি মাটির পুতুল
মানুষ তাহারো কাছে তুচ্ছ, নহে সে তাহারো সমতুল!
জীর্ণ ইট-কাঠে-গড়া মসজিদ মন্দির–
ঝরিলো তাহারো লাগি, বহু রক্ত, বহু অশ্রুনীর।
ওই বুঝি ধর্ম গেলো– মানুষের চোখে নাই নিদ্,
দেখে না সে ধর্ম তার জীবনের ভিতে কাটে সিঁদ!
মানুষে মানুষ মারি' ধর্ম রাখে, হয় ধর্মবীর;–
ধর্ম ঠেলে মরণের পথে নির্বোধ দুর্ভাগাদের ভিড়।
ধর্ম? হায়, নগ্ন চোখ মেলি' দেখ তার ভয়াবহ রূপ–
জীবনের রক্ত মাংসে সে যে– মরণের কঙ্কালের স্তূপ!
তার লাগি আত্মদান! নরহত্যা। ব্যর্থতা-বরণ।
জীবনের সৃষ্টি আজ জীবনে করেছে আবরণ!
তুচ্ছ মিথ্যা ভাবের ফানুস–
মানুষ সৃজেছে ধর্ম, ধর্ম কভু সৃজেনি মানুষ।
কিন্তু হায় তারো মূল্য আছে– প্রাণ দিয়ে শোধ করা চাই,
মানুষের কোনো মূল্য নাই!
মানুষের গড়া মিথ্যা ভৌগোলিক সীমা
তাহারো মর্যাদা আছে, রয়েছে মহিমা!
তারো লাগি সৈন্যদল পুষ্ট হয় বন্য বৃত্তি তরে,
লাঙ্গলের ফাল ভাঙি' তরবারি গড়ে।
একদল মানুষেরে সর্বভাবে করিয়া বঞ্চিত
জীবন্ত অস্ত্রের মত কেল্লাঘরে রাখে সুসজ্জিত,
চিরবন্দী হিংস্র পশুদল–
মানুষেরে মারিবার তরে তাহাদের জীবন কেবল।
দেশের সম্পদ যত, সৃষ্টি যত, যত কিছু ধন
সব নিয়ে চলে শুধু মানুষ-মারার আয়োজন।
মানুষেরে মারিবার তরে মানুষ জোগায় রাজকর,
মানুষে খাটায় মাথা,
রচে বসি' হিংসা-শাস্ত্র, ঘাতকের বীরত্বের গাথা–
নব নব অস্ত্র গড়ি' বিজ্ঞানের বলে
মানুষেরে বানায় বর্বর!
পৃথিবীরে ভাগ-যোগ করি' মানুষ রচিল নানা দেশ,
হেথা হ'তে হোথা যদি যাবে
কেন নাহি যায় বন্ধুভাবে–
কেন পরে ভ্রাতৃরক্ত-মাখা দেশজয়ী জল্লাদের বেশ?
পায়ের মাটিরে দিলো কিনা মানুষ মাথারো বড় ঠাঁই,
মাটিরো রয়েছে কিছু দাম, মানুষের কোনো দাম নাই!
কখনো শুনেছ কারো মুখে–
বাঘেরে খেয়েছে বাঘ, ভালুক ভালুকে?
মানুষে মানুষ খায়, খেয়ে বেঁচে থাকে প্রতিদিন–
রক্ত খায়, মাংস খায়, মেদমজ্জা খেয়ে করে ক্ষীণ,

খায় মন-আত্মা, খায় জীবনের অর্ধেক নিঃশ্বাস–
অবশেষ-জীবন্ত-কঙ্কাল ফেলে দেয়, করো কি বিশ্বাস?
যাও– যেথা যেথা কল-কারখানা, যাও গ্রামে গ্রামে,
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর মনুষ্যত্ব চড়েছে নিলামে।
মানুষের জীবনের হেলাভরে খেলা
যেথায় চলেছে দুই বেলা।
খনি ভেঙে কুলি বহে শিরে করি' কয়লার চাপ–
তারি সাথে বহে যেন দুনিয়ার তিক্ত অভিশাপ।
জঙ্গল কাটিয়া তারা বসায় সহর
তার রক্তে বহে সেথা বিলাসের বিষম বহর।
সে সহরে বিলাসীর লাগি রমণীরা রূপ দেয় ডালি,
নারীর নারীত্ব পায়ে দলি' পুরুষেরা দেয় করতালি।
অমৃতের মৃতপ্রায় পুত্রগণ দাস হ'য়ে নগরীর পথে,
দুর্বহ জীবন-বোঝা টেনে নিয়ে চলে কোনো মতে।
ফুল্ল ফুল ঝরি' নিত্য চুমে নগরীর পথ-শিলা,
নিত্য যেথা অত্যাচার অনাচার মদিরার লীলা;
রমণীর রূপ রস জীবন যৌবন
বিপণির পণ্য সেথা ক্ষণিকের তুচ্ছ প্রয়োজন।
আর যারা গড়িল শহর সর্বহারা বঞ্চিতের দল
কোথা তারা, সে শহরে কোথায় তাদের ঠাঁই বল্?
পথ পাশে– যেই পথ নিজ হস্তে করিল নির্মাণ,
প্রাসাদের নীচে– গড়িল যা বিন্দু বিন্দু রক্ত করি' দান।
সেথা ঐ দীনহীন মুষ্টি-অন্নে করে মারামারি
কুক্কুরের জ্ঞাতি আজ– ওই তারা পথের ভিখারী।
সহস্রের রক্ত শুষি' একজন পুষ্ট করে দেহ,
ধনীর প্রাসাদ ওঠে ভাঙি' লক্ষ দরিদ্রের গেহ।
দৈন্য-দীর্ণ কক্ষ-মাঝে প্রাণ-জীর্ণ মানুষের দল
জীবন্ত-কবরে করে জীবনের লাগি কোলাহল!
তুমি বলো, ইহাদের তরে আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
অন্ন চাই, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু–
ইহাদের বুকে আশা, মূক মুখে ভাষা দেওয়া চাই।
আমি বলি, ইহাদের জীবনের কোনো মূল্য নাই!
মানুষের মানুষ শিকারী–
নারীরে করেছে বেশ্যা, পুরুষেরে করেছে ভিখারী।

MOTHERS' DAY

DR. DILIP CHAKRABORTY

God casually created creatures-other,
But with all care, He created "Mother".

Sanskrit word for mother is 'Matri", .
She is mankind's real nurse-"Dhatri".

In Hindi mother is called "Mata",
She is our real "Paritrata".

Guyanese fondly calls mother "Mummy".
She is the friend, philosopher-the real chummy.

Mother's love for her daughter and son,
Is unique and can be compared with none.

For the well-being of her beloved child,
Mother can be lion-like brave and flower-like mild.

By grooming a father we groom one person,
By grooming a mother we groom one generation.

On this day, from our heart we say,
We won't forget mother, come what may.

Oh Mother! we bow at the feet of thine,
You are our lives blessing Divine.

কল্যাণময়ী মা দুর্গা

মৃণাল কান্তি মজুমদার

ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমহস্তুতে ॥

এস মা দুর্গা জগৎ জননী,
এস এবার প্রতিবারের মত।
কৈলাস ছেড়ে বাপের বাড়ি,
তোমার সন্তানেরা অপেক্ষারত ॥

আসবে সাথে সিদ্ধিদাতা গণেশ,
কার্তিক দেব সেনাপতি।
ধন দায়িনী মা লক্ষ্মী আসবেন,
সাথে বিদ্যার দেবী সরস্বতী ॥

তোমায় ছাড়া শিব পারে না,
থাকতে কৈলাসে একা।
নন্দী, ভিরিঙ্গি আসবে সাথে তাঁর,
তাদেরও চাই তোমাকে দেখা ॥

বর্ষা বিদায়ে এসেছে শরৎ,
ছড়িয়ে পড়েছে বার্তা তারি।
জগৎ জননী আসছেন আবার
তিনিই যে, মোদের রক্ষাকারী ॥

বরণে প্রস্তুত কাঁশ ও পদ্ম,
দোপাটি, শিউলি ফুল।
শিশির সিক্ত ঘাসেরা পরেছে
রবির আলোয় কানের দুল ॥

পেঁজা তুলোর মত মেঘেরা চলেছে,
যেন সমুদ্রে ভাসছে ভেলা,
দীঘি ও পুকুরে অবগাহনে,
পদ্ম, শালুক করছে খেলা ॥

প্রকৃতি রূপের ডালি সাজিয়ে,
জানায় তোমায় মা আমন্ত্রণ।
আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কেউ বাদ নেই,
আনন্দে মাতোয়ারা সবার মন ॥

এইভাবে প্রত্যাশার নিরসন করে,
আসে মহামায়ার 'ভোর'।
বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের স্তোত্র পাঠে,
সবার চোখে জাগে স্বপ্নের ঘোর ॥

আনন্দ আজ বাঁধন হারা,
চারদিকে পূজার গন্ধ।
বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা,
বয়ে আসছে বাতাস মৃদুমন্দ ॥

তুমি মা দুর্গা পূজিত হও,
বাংলার ঘরে ঘরে।
কালী, চণ্ডী, জগদ্ধাত্রী নামে,
ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরে ॥

একদিকে তুমি অসুর নাশিনী,
অন্যদিকে মা কল্যাণময়ী,
অশুভ শক্তিকে কর পরাভূত।
হও তুমি মা পূর্ণ জয়ী ॥

ষষ্ঠীতে তোমার হয় গো বোধন,
পূজার জন্য ঘট স্থাপন।
নতুন পোশাকে আসে যে সবাই,
তোমার চরণ করে দরশন ॥

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে চলে,
তোমার পূজা ভক্তি ভরে।
ঢাকের শব্দে ও চণ্ডী পাঠে,
শারদ গগণ মুখরিত করে ॥

পূজা শেষে অঞ্জলি হয়
তোমার কাছে থাকে প্রার্থনা।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার,
যার যা থাকে বাসনা ॥

অবশেষে আসে দশমীর দিন,
তুমি যাবে কৈলাসে ফিরে।
এয়োরা তোমাকে সিঁদুর পরায়,
এক এক করে, ধীরে ধীরে ॥

আবার এসো মা কানে কানে বলে,
চোখের কোনায় জল নিয়ে।
থাকবো মোরা অপেক্ষা করে,
ভুলোনা যেন কৈলাসে গিয়ে ॥

এর পর আসে নিরঞ্জন পালা,
পুকুর অথবা নদীর জলে,
আসে যত লোক দলে দলে।
সবার মনে বিষাদের ছায়া,
তুমি যে গো মা গেলে (আজ) চলে ॥

আবার নতুন করে প্রত্যাশা থাকে,
তুমি আসবে আবার ফিরে।
আগামী বছর আনন্দ করবো,
এমনি করে তোমাকে ঘিরে ॥

Health and Community Sector Programs at Bangladesh Canada Hindu Cultural Society (BCHCS)

Dear Community Members,

Bangladesh Canada Hindu Cultural Society (BCHCS) was established with an objective to perform rituals and socio-cultural activities. Religious and cultural events are organized round the year to meet community needs and over time BCHCS became a community hub in Toronto for Canadians with cultural roots in South Asia.

In 2012, BCHCS took an initiative to engage seniors with evening prayers, gentle exercise through playing musical instruments, reciting verses and doing other fun activities. About 10 seniors visit BCHCS regularly in the evening six days a week, Monday to Saturday, throughout the year and stays 3-4 hours with their peers. BCHCS volunteers provide pick-up and drop-off services to the seniors through volunteer drivers every day, on rotation from a pool of 25 volunteer drivers.

Recently, BCHCS received funding for multiple projects on health and community sector programs and services for seniors, women and children. Activities proposed in the projects include health awareness, health and community services navigation, disease management, nutrition and balanced diet, computer literacy, financial literacy, recreational/study tours for seniors and children, and establishment of a seniors club within the BCHCS premises.

During January-April 2017, BCHCS implemented a project to enhance awareness of seniors on Ontario healthcare system. The follow-up projects will cover awareness and management of illnesses like diabetes, heart attack, stroke, breast cancer, prostate cancer, colorectal cancer, dementia, mental health and many more as identified by community members in need assessments.

To reach out participants in communities, we send group emails on activities to over 1,500 BCHCS members. The information on upcoming activities arealso posted in our website and advertised in community Bengali newspapers. The activities are accessible to all people irrespective of their race, culture and religious affiliations. Discussions in the workshop are translated into Bengali by professional interpreters and questions can be asked in Bengali, Hindi or English.

Health professionals of a community sector organization are facilitating health service navigation workshop at BCHCS.

Meditation and yoga sessions will be accommodated in future events. TTC tokens, healthy snacks and vegetarian foods are provided. Pick-up and drop off services to and from BCHCS for seniors can be arranged in special circumstances. We believeall these activities will help our community members to remain healthy and happy. To participate in our health and community sector project activities add your email address in our group email and read BCHCS emails regularly. ❑

Thank you for your cooperation and support.

Swapan Kumar Das
Project Management Subcommittee, BCHCS and BCHM.

বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির-এর নিত্য সান্ধ্যপূজা, প্রার্থনা এবং হরিনাম সংকীর্তন প্রসঙ্গে বিনীত আহ্বান–

'বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু কালচারাল সোসাইটি' টরন্টোস্থ বাঙালী হিন্দু কমিউনিটির একটি প্রাচীনতম সংগঠন। ২০০৫ সালে কমিউনিটির প্রয়োজনে এই সংগঠন যেই চ্যারিটির রেজিষ্ট্রেশন করেছিল, মন্দির কেন্দ্রিক কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে কমিউনিটির সকলের সহযোগিতায় সেটিই আজকের এই সুন্দর স্থায়ী মন্দির– "বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির"। এটি কমিউনিটির একটি অসামান্য সফলতা। সংগঠনটি আমাদের নিজস্ব সনাতন ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পাশাপাশি সকলের চাহিদা পূরণে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সর্বান্তকরণে চেষ্টা করে চলেছে। কমিউনিটির প্রতিটি মানুষের আন্তরিক সমর্থনই এই বাস্তবায়নের মূল ভিত্তি এবং তাদের নিরন্তর সহযোগিতাই এই সংগঠনের মূল চালিকা শক্তি।

আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন, মন্দিরটিতে বছরের ৩৬৫ দিনই সন্ধ্যায় নিয়মিত পুরহিতগণের পরিচালনায় সান্ধ্যপূজা ও আরতি এবং নিয়মিত কীর্তনিয়া দলের পরিচালনায় প্রার্থনা এবং হরিনাম সংকীর্তন সম্পন্ন হয়।

চিত্রে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নিয়মিত কীর্তনিয়া দলকে– শত ব্যস্ততা, যে কোন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এমন কি ৪০ সেন্টিমিটার বরফ কিংবা ব্ল্যাক আউট পরিস্থিতি উপেক্ষা করেও যাঁদের পরিচালনায় ৩৬৫ দিন সন্ধ্যায় প্রতিদিনের প্রার্থনা এবং হরিনাম সংকীর্তন সম্পন্ন হয়ে আসছে। এই প্রবাসে এটি কতটা দুরূহ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবুও বাঙালী হিন্দুদের প্রাণকেন্দ্র ও সকলের প্রিয় এই সংগঠনটি প্রগতির আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে উত্তরোত্তর সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই দুরূহ কাজে সহায়তা করার জন্যে আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। কিছু স্বেচ্ছাসেবী আহ্বান করছি যারা আমাদেরকে এই কর্ম সম্পাদনে সহযোগিতা করে এই মন্দিরের চলমান কার্যক্রমকে আরও বেগবান করে তুলবেন, প্রতিদিনের সান্ধ্যপূজা ও হরিনাম সংকীর্তন পরিচালনায় সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ করে সত্যিকার অর্থেই একটি মন্দিরের আবহ তৈরি করবেন।

জয় হোক সনাতন ধর্মের। জয় হোক বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দিরের।

ভগবান আমাদের সকলের সহায় হোন। ❑

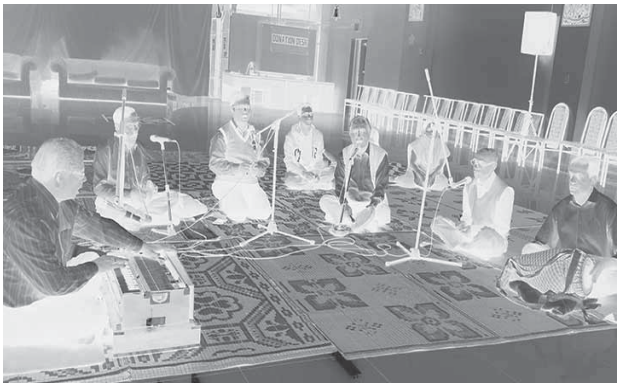

যোগাযোগ :
বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির
১৬ দোম এভিনিউ, ইস্ট ইয়র্ক, এম১বি ১ওয়াই৯
ফোন : (৪১৬) ৬৯৩ ৪৪৪৪

প্রকৃতির অমোঘ বিধানে
নির্মম সত্যকে বরণ করে
যাঁরা চলে গেছেন অজানা স্থানে
যাঁদের স্মৃতি ও কীর্তি
আমাদের অনুভূতিকে আজও
স্পন্দন জাগায়
তাঁদের স্মরণে।

বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু কালচারাল সোসাইটি ও
বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির
টরেন্টো

Abeer Das, Grade : 7

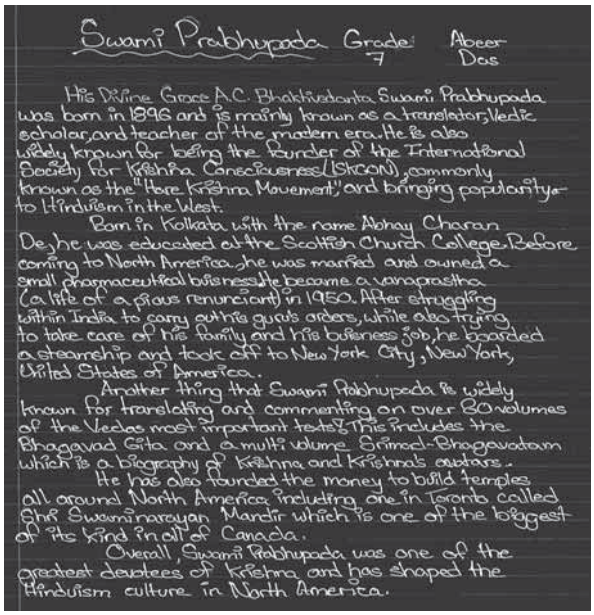

Swami Prabhupada Grade: 7 Abeer Das

His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada was born in 1896 and is mainly known as a translator, Vedic scholar, and teacher of the modern era. He is also widely known for being the founder of the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), commonly known as the "Hare Krishna Movement," and bringing popularity to Hinduism in the West.

Born in Kolkata with the name Abhay Charan De, he was educated at the Scottish Church College. Before coming to North America, he was married and owned a small pharmaceutical biusness. He became a vanaprastha (a life of a pious renunciant) in 1950. After struggling within India to carry out his guru's orders, while also trying to take care of his family and his biusness job, he boarded a steamship and took off to New York City, New York, United States of America.

Another thing that Swami Prabhupada is widely known for translating and commenting on over 80 volumes of the Vedas most important texts. This includes the Bhagavad Gita and a multi volume Srimad-Bhagavatam which is a biography of Krishna and Krishna's avatars.

He has also founded the money to build temples all around North America including one in Toronto called Shri Swaminarayan Mandir which is one of the biggest of its kind in all of Canada.

Overall, Swami Prabhupada was one of the greatest devotees of Krishna and has shaped the Hinduism culture in North America.

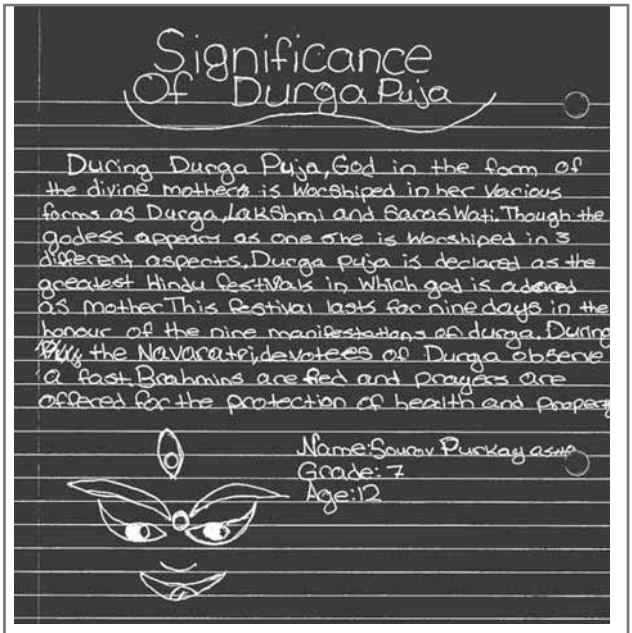

Significance Of Durga Puja

During Durga Puja, God in the form of the divine mother is Worshiped in her Various forms as Durga, LakShmi and SarasWati. Though the godess appears as one she is Worshiped in 3 different aspects. Durga puja is declared as the greatest Hindu festivals in Which god is adored as mother. This festival lasts for nine days in the honour of the nine manifestations of durga. During [illegible] the Navaratri, devotees of Durga observe a fast. Brahmins are fed and prayers are offered for the protection of health and proper[illegible]

Name: Sourov Purkayastha
Grade: 7
Age: 12

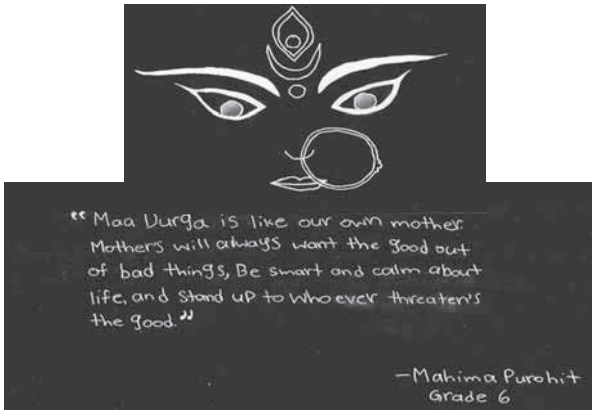

" Maa Durga is like our own mother. Mothers will always want the good out of bad things, Be smart and calm about life, and stand up to who ever threaten's the good. "

—Mahima Purohit
Grade 6

VALI (King of Monkeys)

SHOUVIK SAMADDER (AGE-12)

There was once a Rakshasa named Dundubhi, who considered himself the mightiest of all creation. One day, he decided to challenge King Vali. He transformed into a mean looking buffalo. Vali came off his throne and took possesion as he bashed Dundubhi down onto the ground. Although Dundubhi had died that day, Mayavi, the son of Dundubhi decided to take on Vali. So Vali came out, with his brother Sugreeva. Mayavi knew he could take on one monkey, but not two! So he fled back to his cave. Vali told Sugreeva to wait outside the cave while he kills Mayavi. Several days had past, when there was Mayavi's victory triumph, and so Sugreeva thought Vali was dead. So, he took a big boulder and blocked the entrance, so Mayavi could not come out. Sugreeva sadly went home and had no other choice, but to be King. Every time Sugreeva sat on the throne, he remembered about Vali. Meanwhile, Vali had killed Mayavi and headed out, when he saw a big boulder blocking the cave. So, with all his might, he pushed the boulder away. When Sugreeva saw Vali, he was so relieved, but seeing the crown on his head, Vali furiously banished Sugreeva out of his land. He didn't even let Sugreeva speak. So Sugreeva and his best friend, Hanuman set off to a journey, where they met Ram and Lakshman. They became allies and made a deal, that if Ram kills Vali, Sugreeva would help bring back Sita from Ravana. But Sugreeva couldn't believe that Rama could be able to defeat Vali.

Sugreeva told Rama that Vali took his arrows, one by one, piercing seven of the trees. But if Rama pierces all seven trees with just one arrow, then he would be convinced. So Rama did that and even the arrow flew back to his quilt. Now that Sugreeva was convinced, he challenged Vali to a battle. Rama shot his arrow and through Vali's chest. Vali, on the ground, could not understand why Rama had interfered in the fight. So Rama told Vali how it is the duty of a king to mete out justice, to protect the oppressed and punish the oppressor. He had wronged his younger brother whom he should have cherished as his own son. Therefore, he deserved to die. So, Vali appoligized to Sugreeva and breathed his last as Vali's wife, son, and brother, Sugreeva all cried. So, Sugreeva became the King and helped Rama with his mission of saving Sita.